গোস্বামী

শ্রীরঘুনাথদাস

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী
মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিতা শিষ্যা
শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়, ব্যাকরণতীর্থ-প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
৮ হৃষীকেশ, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২১ ভাদ্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ ; ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ

ভিক্ষা—৫·০০ টাকা

প্রকাশক ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ—শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টনবাজার
গৌহাটী-৮ (আসাম)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
আগরতলা (ত্রিপুরা)

মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রেস

৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উৎসর্গপত্র

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলেষু

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! আপনার অহৈতুককৃপাদেশ ও স্নেহাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করতঃ এই গ্রন্থ লিখনরূপ দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহা আপনারই কৃপায় কোনপ্রকারে সমাপ্ত করিয়া সমস্তই আপনার মকরন্দস্রাবিকরকমলে সমর্পণ করিলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আপনার ভৃত্যানুভৃত্যাধমা আমি কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীগুরুপূর্ণিমা
২৯, পার্ক সাইড রোড
কলিকাতা-২৬

সেবিকা
শ্রীশান্তিমুখোপাধ্যায়

২৯ বামন, ৪৯০ শ্রীগৌরাব্দ ;
২৭ আষাঢ়, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ;
১১ জুলাই, ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় দীর্ঘদিন পরে আজ তাঁহার নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঠাকুরের পূত জীবনচরিত প্রকাশিত হইতেছেন। জীবের দুঃখের কারণ ভগবদ্-বিমুখতা। পরমদয়াল, পরমকরুণাময়, ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব জীবের দুঃখে কাতর। তিনি চিরশান্তিময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জীবের চিত্ত উন্মুখ করাইবার জন্য এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। জীবের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তটিকে মায়াময় সংসার হইতে তুলিয়া লইয়া যাহাতে পরম দয়াল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে সংলগ্ন করান' যায়, তজ্জন্য তিনি কতইনা উপায় অবলম্বন করিতেছেন! সাধারণ মনুষ্য-জগতে ধারণা—কিছু বয়স হউক, তবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে। কিন্তু সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 'নিঃশ্বাসে নৈব বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধোভবিষ্যতি'। আমার মনে হয়, সেই জন্যই পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব হঠাৎ একদিন আমাকে আদেশ করিলেন—'ধীরে ধীরে ষড়্গোস্বামীর জীবনচরিত সহজ সরলভাবে লেখার চেষ্টা কর এবং তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করাইবার যত্ন কর। শিশুকাল হইতে মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে বালকগণের রুচি নিশ্চয়ই ভগবানের দিকে যাইবে, তাহা হইলে তাহাদের মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা

সম্পাদিত হইবে—প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।' এই অধমের প্রতি এই গুরুভার, চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অপর দিকে আবার তখনই মনে হইল, 'বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ।' আমি তাঁহার অধম সন্তান, তিনি মঙ্গলময়, আমার চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি জাগাইবার জন্যই আমার মঙ্গল কামনায় তিনি এই কৌশল করিলেন। কিন্তু কিপ্রকারে গুরুবাক্য পালন করিব ভাবিয়া কূল পাই না। এত অধম আমি, 'তিনি যেমন আদেশ করিলেন, আবার শক্তিও তিনিই দিবেন', সেই চিন্তা নাই। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥' —এই বাক্যটি মনে পড়িতেই স্বস্তি পাইলাম। তিনি একখানা অতি জীর্ণ গ্রন্থ আমাকে দিয়া বলিলেন, ইহা হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে। সেইদিন হইতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এতদিনে তাহা কোন-প্রকারে সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জানি-না ঠিক ঠিক তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারিলাম কি না। অধম সন্তানের দোষ-ত্রুটি তিনিই মার্জ্জনা করিবেন —ইহাই একমাত্র ভরসা।

আমার শ্রীশিক্ষাগুরুদেব পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ আমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ সংশোধন করতঃ আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সুযোগ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমি চিরঋণী। আমাদের পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন—'কিভাবে গুরুসেবা করিতে হয়, কিভাবে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হয়— এসব কথা যদি শ্রীশিক্ষাগুরুবর্গ আমাদিগকে জানাইয়া না দেন, তাহা

হইলে সদ্‌গুরু পাইয়াও প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া ফেলিতে হয়, গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।' পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ নিজগুণে আমার প্রতি সুখী হইয়া চিরকাল আমাকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মসেবা-শিক্ষা প্রদানে প্রতিপালন করিবেন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত প্রার্থনা।

গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি সংশোধন হইবার পর ইহার মুদ্রণ-বিষয়ে আমি খুবই উদাসীন ছিলাম। কিন্তু আমার গুরুভ্রাতৃদ্বয় শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী সেবাব্রত এবং শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রসূন, তাঁহারা সাক্ষাৎ হইলেই আমার প্রতি স্নেহগৌরবে আমাকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দিতেন। তাঁহারা উভয়েই আমা হইতে বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহা-দের উৎসাহে আমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীগুরুসেবায় সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানকারী গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট আমার এই প্রার্থনা—তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া আমাকে নিরন্তর এই প্রকার সেবোৎসাহ প্রদান করতঃ আমার মঙ্গল বিধান করেন।

গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মহিমা, আর যাহা কিছু অশোভন, অপ্রশংসনীয় ও ভ্রমাদিযুক্ত, তাহা মাদৃশ অযোগ্য দীনহীন সঙ্কলয়িতার অজ্ঞতা-প্রসূত।

পরিশেষে গভীর হৃদয়বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, আমার স্নেহময় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্) মহোদয় হঠাৎ গত ২১শে বৈশাখ, ১৩৮৩ ; ইং ৪ঠা মে, ১৯৭৬ মঙ্গলবার তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজগৃহে ৭৮ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। তিনি এই গ্রন্থের লিখন ও মুদ্রণ-বিষয়ে আমাকে খুবই উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, পীড়াকাতর অবস্থায়ও

ইহার মুদ্রণারম্ভ শ্রবণে তিনি প্রচুর হর্ষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দিতে পারিলাম না, এদুঃখ এজীবনে আমার দুরপনেয় এবং বড়ই হৃদয়বিদারক—মর্ম্মন্তুদ। তিনি তাঁহার নিজ বাঞ্ছিত ধাম হইতে তাঁহার এই অধম অযোগ্য সন্তানকে কৃপাশীর্ব্বাদ করুন— আমি যেন শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে বর্দ্ধমান রতির সহিত ভজন-সাধন করিয়া নিজ জীবন সার্থক করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলেরই প্রীতিভাজন হইতে পারি।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবিকা—
শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

'গোস্বামী রঘুনাথ দাস' গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ নিঃষেশিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পূত চরিত্র ও শিক্ষা আলোচনার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমরা উল্লসিত হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্
কলিকাতা-২৬ } প্রকাশক

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভবাসর
২১ ভাদ্র, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ,
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি আমার অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞানের দিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখ করাইবার জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিতেছেন, সেই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে বন্দনা করি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা করিতেন—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নাম ও মন্ত্র, শচীনন্দন গৌরহরি, স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী ও গোষ্ঠবাটী বৃন্দাবন-ধাম, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং রাধামাধবের সেবা-প্রাপ্তির আশা যাঁহার অপার করুণায় প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি প্রণাম করি।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের এই প্রকার অপার মহিমা। কিন্তু আমার ত' তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বোধ নাই, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছুই নাই। তবে কি প্রকারে সেই গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করিব? পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ত' অন্তর্য্যামী, তিনি আমার অযোগ্যতা এবং অক্ষমতা সবই জানেন, তথাপি আজ এই গুরুভার

আমাকে কেন দিলেন? তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বদাই তিনি আমার মঙ্গলের জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি "বৈষ্ণবের গুণগান, করিলে জীবের ত্রাণ।" আবার পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥"

যদিও আমার কোন যোগ্যতা নাই, তথাপি তিনি আমার মঙ্গলার্থেই এই প্রকার আদেশ করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়, সন্তান অসৎপথে গেলে তাহাকে সৎপথে আনিতে পিতামাতা নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পারমার্থিক জগতেও পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব, যিনি একাধারে মাতা, পিতা এবং প্রভু, তিনিও তাঁহার সন্তানের মঙ্গলার্থে নানা প্রকার যত্ন করেন। অধম আমি, তাঁহার আদেশ পালন করিবার সামর্থ্য ত' আমার নাই, তবে একমাত্র ভরসা আছে তাঁহার কৃপা, যাহা দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। তিনি পরম দয়াল, পরম করুণাময়, তাঁহার আদেশ পালন করিবার শক্তি আবার তিনিই দিবেন। তিনি আমাকে কৃপাশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার আদেশ পালন করিয়া আমি নিজে কিছু মঙ্গল লাভ করিতে পারি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা।

সপ্তগ্রাম

সপ্তগ্রাম ই, আই, আর লাইনে হুগলী জেলার অন্তর্গত 'ত্রিবেণী' রেল ষ্টেশনের সান্নিধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন বন্দর ও নগর। সপ্তগ্রামের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রথমতঃ সরস্বতী নদীর পরিচয়

পাওয়া দরকার। কারণ এই নদীর তীরেই বন্দরটি অবস্থিত, রূপনারায়ণ নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত, তাহার কিছু উত্তর দিয়া সরস্বতী প্রবাহিতা হইত। এই সরস্বতী বক্ষে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রোম, পর্টুগীজ ও ইয়োরোপের অন্যান্য প্রদেশের বাণিজ্যতরী প্রতিনিয়ত বিরাজ করিত। হাওড়ার অন্তর্গত আমতা ও সাঁকরাইলের নিম্নে এখনও সরস্বতী বক্ষে নৌকা যাতায়াত করে বটে, কিন্তু সরস্বতীর সেই বিপুল প্রভাব এখন কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। সেই বিপুল বিস্তারও নাই, তরঙ্গও নাই।

পুরাণে এই সরস্বতী পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রয়াগ—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলী।

এই সরস্বতীর তীরেই সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। পৌরাণিক সময় হইতেই সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধি। কথিত আছে, কান্যকুব্জাধিপতি প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র এই নদীতীরে সাতটী গ্রাম (যথা—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর) শাসন করিতেন। সপ্তগ্রাম বলিতে এই সাতটি গ্রামের সমষ্টিকেই বুঝাইত। এখন যেমন কলিকাতা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, সেইরূপ মুসলমান রাজত্বের সময় সপ্তগ্রাম ছিল প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ও রাজধানী। এখানে মুদ্রাদিও প্রস্তুত হইত। এখানকার শাসনকর্ত্তারা ভারতসম্রাট্‌কে গ্রাহ্য করিতেন না। স্থানীয় মুসলমানেরা এখানকার প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন। ইহার সীমা যশোহর ভৈরবনদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৯২ খৃঃ পাঠানগণ ইহা লুণ্ঠন করে এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ও প্রসিদ্ধ বন্দর ধ্বংস হয়।

এই ত' গেল ঐতিহাসিক দিক্। তীর্থস্থান হিসাবেও ইহার প্রচুর খ্যাতি রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্য ৫ম ৪৪৩-৪৪৭) ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে—

"কতদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণসহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত যে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দ-চরণ॥
তিন দেবী সেইস্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণী-ঘাট' সকল-ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে॥"

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলী ত্রিবেণী হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থলী। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যখন ত্রিবেণীতে গমন করেন, তখন ইহা শিক্ষা-সমাজের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া সম্মানিত হইত। সেই সময়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী এই চারিস্থান সংস্কৃত-শাস্ত্রের শিক্ষা-সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক ত্রিবেণীতেই ৩০টি শিক্ষালয় ছিল। মকর-সংক্রান্তি, বিষুব-সংক্রান্তি, বারুণী, দশহরা ও কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে ত্রিবেণীতে বিপুল লোকসংঘট্ট—মেলা হইত।

বংশ-পরিচয়

এই সময়ে সপ্তগ্রামের নিকট শ্রীকৃষ্ণপুরে এক ক্ষমতাশালী ও বিপুল বৈভবসম্পন্ন হিন্দু পরিবারের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ এবং সৎকুলীন। এই বংশে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। দাস হইলেও তাঁহাদিগকে 'মজুমদার' বলা হইত। নবাবী আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষককে

'মজুমদার' বলিত। তাই তাঁহাদের হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার বলিয়াই খ্যাতি ছিল। রাজকার্য্যে ইঁহারা অচিরেই বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। মুসলমানদের অত্যাচার হিন্দুগণের বড় ক্লেশের কারণ হইতেছে দেখিয়া ইঁহারা সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্তৃত্ব ইজারা অর্থাৎ স্থায়ী-রূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় তৎকালে বারলক্ষ মুদ্রা। সেই সময় টাকায় ৮/ মন চাউল পাওয়া যাইত। এত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস সৎকর্ম্মে নিরত থাকিতেন। ইঁহারা ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত ও দানশীল বলিয়া জন-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের দানে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দান বিষয়ে তাঁহাদের যশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহাদের বাড়ীতে বারমাস দান-যজ্ঞ-পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে—

" 'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন',—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥"

হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্যের সমাদরও করিতেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলন-রত ব্রাহ্মণগণেরই বাস-স্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদি দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল। তাঁহাদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

প্রত্যেক বস্তুরই দুইটি দিক্ আছে। একটি বাহ্য, অপরটি তাত্ত্বিক। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটই তাত্ত্বিক দিক্ প্রকাশিত হয়। আমার ন্যায় ভগবদ্ বিমুখের নিকট তাত্ত্বিক দিক্ প্রকাশিত হইতে পারে না। বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পূত চরিত্রের বাহ্য দিকের সামান্য একটু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব মাত্র। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই কৃপালু। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু এই অধমকে কৃপা করুন, যাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজের কিছু মঙ্গল বিধান করিতে পারি।

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুরে উক্ত শৌক্র কুলীন বংশজাত শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া ১৪১৬ শকাব্দে ইং ১৪৮৬ সনে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আবির্ভূত হন। ইনি ষড়্গোস্বামীর অন্যতম। তাঁহার প্রকট ভূমিতে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাহারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'ভজনাসন' বলিয়া একটি নাতি-উচ্চ প্রস্তর-আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এই আসনে বসিয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। ইহার পাশেই সরস্বতী নদী বিরাজিতা।

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও রঘুনাথ শৈশব হইতেই বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। অন্যান্য বালকদের মত আহার, বিহার, খেলাধূলা বা বালসুলভ চপলতায়

তাঁহার রুচি ছিল না, বরং ঐ সকল কার্য্যে অযথা সময়ক্ষেপ তাঁহার বিরক্তিকরই মনে হইত। পড়ার সময় ছাড়া প্রায় সকল সময়েই তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের কথা চিন্তা করিতেন। জড়বিষয়-কোলাহলে তাঁহার মন কখনও আকৃষ্ট হইত না। ছোটবেলা হইতেই বৈরাগ্যের পবিত্র জ্যোতিঃ তাঁহার মধুর কান্তিতে প্রতিভাত হইত। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে—

"সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হইতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥"

শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকেও বাল্য-কাল হইতেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বালক রঘুনাথ তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীমদ্ বলরাম আচার্য্যের বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সাত্ত্বিক, সদাচারী পণ্ডিত এবং সৎপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীভগবানে তাঁহার একান্ত ভক্তি ছিল। কোন সাধুজন পাইলেই তিনি তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া তৎসমীপে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেন। সেই সুযোগে রঘুনাথও ভক্তিভরে সেই সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে এই চাঁদপুর গ্রাম বিদ্যমান। এখানে শ্রীমদ্ বলরাম ও শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের ঘর ছিল। শ্রীমদ্ যদুনন্দন আচার্য্য ছিলেন মজুমদার পরিবারের কুলগুরু। বলরাম আচার্য্য শ্রীল ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে এক পর্ণকুটীরে স্থান দিলেন। সেখানে থাকিয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় হইতেই বালক

রঘুনাথের বড় সৌভাগ্যের উদয় হইল। এক মুহূর্ত্তও শ্রীল ঠাকুরের চরণ ছাড়া থাকিতেন না। প্রতিদিন তাঁহার চরণ-ধূলি লাভ করিতেন। আর তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীভগবানের সুধামাখা নাম শুনিয়া বিভোর থাকিতেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য, ৩য় পরিচ্ছেদ)—

"হরিদাস-ঠাকুর চলি' আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপা-পাত্র, তা'তে 'ভক্তি' মানে।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথদাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন॥"

বালক রঘুনাথ দৈত্যকুলের প্রহলাদ ছিলেন না। তাঁহার পিতা এবং জ্যেঠাও সর্ব্বদাই সাধু, সজ্জন এবং পণ্ডিত দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। শুধু জমিদারী কাজ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন না। সাধুদের সমাগম হইলে দুই ভাই তাঁহাদিগকে পরম আদরে নিজ বাড়ীতে স্থান দিয়া নানা প্রকার সেবা করিতেন।

"একদিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লইয়া॥
ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন॥

হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

একদিন শ্রীবলরাম আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে লইয়া মজুমদার সভায় আসিলেন। দুই ভাই শ্রীল ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। এদিকে আবার বালক রঘুনাথেরও ঐ প্রকার ভক্তি দেখিয়া শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বড়ই আনন্দ পাইলেন এবং বালকের দিকে তাঁহার চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহাকে কৃপা করিলেন। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

"হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥"

এই সাধনের প্রথম প্রারম্ভই সাধুসঙ্গ লইয়া। সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপাই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র প্রধান উপায়। আজ বালক রঘুনাথেরও শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিবার প্রথম পথ হইল—নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন-বিজয়ী নাম চতুর্দ্দিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রঘুনাথের কাণেও তাহা আসিয়া পৌঁছিল। শ্রীল ঠাকুরের কৃপায় পরবিদ্যা—ভক্তি অর্জ্জনের অধিকারী হইয়া রঘুনাথ জড়বিদ্যা অর্জ্জনের স্পৃহা ত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বিষয়-বিরক্ত হইয়া রঘুনাথের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল—কি করিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব-পরিচয়

মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠাকে বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন।

উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া 'দাদা' সম্বোধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ)—

"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার ॥
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে করাছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥"

সুতরাং দেখা যায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকার প্রীতি-সম্বন্ধ ছিল। সেই সময়ে ব্রাহ্মণে-শূদ্রে ব্যবহারিক সৌভ্রাত্র বা সৌহার্দ্দভাব দেখা যাইত। এই প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে উভয় পরিবারের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা উভয় পরিবারই জানিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথাও এইভাবে শ্রীমদ্ রঘুনাথ ঘরে বসিয়াই শুনিতেন। ক্রমে তাঁহার (গৌরাঙ্গের) চরণ-যুগল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার (রঘুনাথের) হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—এই সংবাদে সমগ্র বঙ্গদেশ অতীব বিচলিত, বিক্ষুব্ধ ও বিরহবিহ্বল হইয়া উঠিল। সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদ অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে কেহ বিস্মিত, কেহ চমৎকৃত, কেহ বা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে অনেকেই একেবারে মর্ম্মাহত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে সপ্তগ্রামেও এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ও ইহাতে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। অতঃপর তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমে তিন দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু এই সংবাদ পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজালয়ে আনাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস ইহা জানিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার প্রাণারাধ্য নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণ-

দর্শন-লালসায় জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা অনায়াসে অনুমতি দিলেন। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীর দর্শনে নবানুরাগী রঘুনাথের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্য আরও প্রবলভাবে দেখা দিবে, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ হইয়াও রঘুনাথের এই হৃদ্‌গতভাব ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

প্রথম-মিলন

পিতা ও জ্যেঠার অনুমতি পাইয়া রঘুনাথের আনন্দের আর সীমা রহিল না। রঘুনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে শান্তিপুর আসিয়া প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সময়ে সেখানে মহাসংকীর্ত্তন চলিতেছে এবং তাহাতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক যোগদান করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা শোকাবেগে সন্ন্যাসদাতা ভারতী গোসাঞীকে গালি দিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। প্রভুকে দেখিয়া রঘুনাথের শরীর রোমাঞ্চিত ও অবশ হইল। প্রেমাবিষ্ট হইয়া রঘুনাথ প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

"সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু-পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২২৩-২২৪)

প্রভু তাঁহাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিয়া উঠাইলেন। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ সকলেরই সুপরিচিত। আবার তাঁহার জ্যেঠা এবং পিতার সহিত শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের বিশেষ পরিচয়ও ছিল। সুতরাং অতি যত্নের সহিত রঘুনাথ সেখানে স্থান পাইলেন। মহাপ্রভু যতদিন সেখানে ছিলেন, রঘুনাথও তাঁহার

সঙ্গ-লালসায় ততদিন সেখানে থাকিলেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর কৃপায় প্রত্যহ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন এবং উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। যথা,—(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২২৫-২২৬)—

"তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্টপাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত॥"

ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভগবদুচ্ছিষ্ট আজ রঘুনাথ সহজেই লাভ করিলেন। ইহা অপেক্ষা সাধন-ফল আর কি হইতে পারে? ভগবদুচ্ছিষ্ট ভোজন সাক্ষাৎ সাধন-ফল এবং ভক্ত-পদধূলি সাক্ষাৎ সাধন-বল। শাস্ত্রে ইহার মহিমা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত আছে।

"ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৬পঃ ৬০-৬১)

ভগবদ্ ইচ্ছায় রঘুনাথের ভাগ্যে সবই মিলিল। মহাপ্রসাদ-সেবনে রঘুনাথের হৃদয়ে প্রেমের বন্যা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! রঘুনাথের এই সৌভাগ্যের দিন অচিরেই অস্ত গেল। মহাপ্রভু আর কালবিলম্ব না করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিপদের চাঁদের ন্যায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ রঘুনাথের হৃদয় অল্পক্ষণের জন্য আলোকিত করিয়া অদর্শন হইলেন, ইহাতে রঘুনাথের নিকট সমস্ত জগৎ অন্ধকার মনে হইল। রঘুনাথ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

"প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২২৭)

নিদারুণ-বাধা

ঘরে ফিরিয়া রঘুনাথ গৌর-প্রেমে পাগল হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসায় অহর্নিশ অধীর ও অস্থির হইয়া উঠিলেন। আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা, কথাবার্ত্তা—কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। একাকী থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ চিন্তা করেন। এই অবস্থায় সংসারে থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার মনের ইচ্ছা পিতা-মাতাকে জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র স্নেহের সন্তান রঘুনাথকে কিছুতেই গৃহ ছাড়িতে অনুমতি দিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনি পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাও বিফল হইল। রঘুনাথের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি যেন নীরব হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথের অবস্থা এখন ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। শ্রীভগবানের জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাঁহাকে এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। আমি ভগবদ্-বিমুখ-সংসারের কীট, সুতরাং এই অবস্থা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যত বাধা পাইতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার প্রেমোন্মাদনা বাড়িতে লাগিল। ভক্ত-ভগবানের লীলা সবই আমাদের শিক্ষার জন্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' প্রথম দর্শনেই তাঁহার নিত্য পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি নানাপ্রকার ছলনা করিলেন। প্রেমেতে পাগল হইয়া যতবার রঘুনাথ পলাইতে

যান, ততবারই অভিভাবকগণ পথ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। পিতা, পিতৃব্য এইবার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। এইবার তাঁহারা আর একটি বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে পাহারা দেওয়ার জন্য সর্ব্বদা ৫ পাইক, ৪ ভৃত্য ও ২ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

"বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২২৮-২৩০)

এই ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার বৈরাগ্য ও উদাসীনভাব দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ অনুসারে শ্রীমদ্ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস একটী পরমা সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বিবাহ-বন্ধনে তাঁহার পরিবর্ত্তন হইবে। ফল বিপরীত দাঁড়াইল। বালিকাটির রূপলাবণ্য ও মধুর সম্ভাষণ রঘুনাথের চিত্তে আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ের কারণ হইল। তাঁহাকে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা হইল। বিলাস উপকরণও যথেষ্ট সংগ্রহ হইল। কিন্তু হায়! রঘুনাথের নিকট সবই বিষবৎ মনে হইল। বরং ইহার ফলে তিনি আরও বেশী অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথ যেন কারা-ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যাইতে লাগিল। অনাহারে, অনিদ্রায় রঘুনাথ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনদাসের সুখের সংসারে দারুণ দুঃখ। রঘুনাথের প্রকৃত মনের ভাব এখনও

তাঁহারা ভালরূপে বুঝিতেছেন না। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও স্নেহের দুলাল রঘুনাথের দশা দেখিয়া তাঁহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেন না, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। কিন্তু রঘুনাথের দুঃখ সবচেয়ে বেশী। সর্ব্বদাই তাঁহার চোখ জলে ভরা, মুখখানি মলিন এবং দৃষ্টি যেন উদাস—চঞ্চল, কি করিয়া গৌর-চরণ লাভ করিবেন, সর্ব্বদাই রঘুনাথ সেই সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বিরহ ব্যতীত প্রেম সমৃদ্ধ হয় না। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-জনকে বিরহ-ক্লেশে দিনাতিপাত করাইয়া এখানে সেই শিক্ষাই দিলেন।

পুনঃ দর্শন

এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া যান। তথা হইতে দুই বৎসর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। পুনঃ নীলাচলে আসিয়া বৃন্দাবন যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ইহাতে মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ও রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভুর এই প্রস্তাবে বাধা দিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভুর অভাবে তাঁহার রাজ্য সম্পদ্ সবই বৃথা হইয়া যাইবে। যে কোন উপায়েই হউক প্রভুকে এখানে রাখিতে হইবে।

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দ রায় রাজার যুক্তি অনুসারে মহাপ্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু—সম্মুখেই রথযাত্রা, সুতরাং ইহা না দেখিয়া আপনার কোথায়ও যাওয়া উচিত হইবে না।' প্রভুও তাঁহা-দের কথা মত রথযাত্রার পরেই শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন। এইবার আবার তাঁহারা যুক্তি দিলেন, 'প্রভু—সম্মুখেই চাতুর্ম্মাস্য, সুতরাং এই সময় ত' অন্যত্র যাওয়া ঠিক হইবে না। বরং চাতুর্ম্মাস্য শেষ করিয়া কার্ত্তিক মাসেই যাইবেন।' প্রভুও তাহাই

করিলেন। কার্ত্তিক মাস আসিলে আবার তাঁহারা শীতকাল বলিয়া আপত্তি করিলেন। এইবার সময় ধার্য্য করিলেন—দোলযাত্রার পর বরং ভালয় ভালয় রওনা হইবেন। ভগবানের অদর্শনে ভক্তের বিরহ বেদনা, তাই আজ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে নানা রকম ছলনা করিয়া বাধা দিতেছেন। মহাপ্রভুও তাহাই স্বীকার করিতেছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্, তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ।" আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য, ১৬ পঃ ১১) আছে—

"যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন॥"

এইভাবে ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াও শ্রীল সার্ব্বভৌম ও রায় রামানন্দের আপত্তিতে তাঁহার যাওয়া হইয়া উঠিল না। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার জন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পুনঃ রথযাত্রা আসিল। চতুর্থ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া পঞ্চম বর্ষে পড়িল। গৌড়ের ভক্তবৃন্দ রথ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় নীলাচলে আসিলেন। রথযাত্রার পর পুনঃ গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। এইবার আবার মহাপ্রভু সকলের নিকট অনুমতি চাহিলেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু চার বৎসর নীলাচল লীলা করেন, তবে তাহার মধ্যে আবার দুই বৎসর দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় কাটাইয়া দেন। শেষে দুই বৎসর পুরীতেই থাকেন—

"এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥

পঞ্চম বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ৮৪-৮৬)

প্রভু পুনঃ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এবং রায় রামানন্দের নিকট অনুমতি চাহিলেন। গৌড় দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কারণ সেখানে তাঁহার পূজ্য বস্তুদ্বয় (১) শ্রীশচীদেবী এবং (২) শ্রীগঙ্গাদেবী দর্শন করিয়া যাইবেন। তাই তিনি তাঁহাদের নিকট পুনরায় অনুমতি চাহিলেন—

"তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি, কহে মধুর বচনে ॥
বহু ত' উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥
অবশ্য চলিব দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি ॥
গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়'।
'জননী', 'জাহ্নবী',—এই দুই দয়াময় ॥
গৌড়-দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ৮৭-৯১)

এইবার তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে আর বাধা দেওয়া উচিত নহে। তবে এখন পুরা বর্ষা, প্রভুর পথ চলিতে বড়ই কষ্ট হইবে। সুতরাং বর্ষান্তে বিজয়াদশমীর পর রওনা হইবেন।

"দুঁহে কহে,—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে, অবশ্য চলিবা ॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়-দশমী দিনে করিল পয়ান ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ৯৩-৯৪)

এতদিনে মহাপ্রভু যাত্রা করিলেন। নীলাচল হইতে প্রথম পাণিহাটি, কুমারহট্ট (শ্রীবাসের গৃহ), ফুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের দর্শন দিতে দিতে তিনি ক্রমে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে আবার রামকেলি গ্রামে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় তাঁহাদের কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার পথে 'কানাই-নাটশালা' পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। কারণ রামকেলি-গ্রামে শ্রীসনাতন গোস্বামী উক্তি করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৬।২৬৬)

"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ, কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥"

এই কথায় তাঁহার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলেন— তিনি ত' একাকীই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সুতরাং আমিও একাকী যাইব, নতুবা একজন মাত্র সঙ্গে থাকিতে পারে। যথা, শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ১৬।২৭০-২৭১)—

" 'দুর্ল্লভ', 'দুর্গম' সেই 'নির্জ্জন' বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিম্বা সঙ্গে একজন ॥
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেলা 'একেশ্বরে'।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল তাঁরে ॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনগমন-সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতটাভিমুখে চলিয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু শান্তিপুর আসিয়াছেন, রঘুনাথের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইল, তিনি পিতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। তাঁহার আরাধ্য-দেব আসিয়াছেন শান্তিপুরে—তাঁহার দর্শনলালসায় রঘুনাথ উন্মাদ। যথা, (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬পঃ ২৩১-২৩২)—

"এবে যদি মহাপ্রভু 'শান্তিপুর' আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥
'আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা, না রহে মোর শরীরে জীবন ॥"

রঘুনাথের শান্তিপুর গমনের একান্ত ইচ্ছা শুনিয়া পিতা অনুমতি দিলেন এবং বহুলোক ও দ্রব্যাদি সঙ্গে দিয়া পুত্রকে তাঁহার ইষ্টদেব দর্শনার্থে পাঠাইলেন। কিন্তু সত্বর ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন।

"শুনি তাঁর পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল বলি' 'শীঘ্র আসিহ ফিরিয়া' ॥" (ঐ ২৩৩)

শান্তিপুরে আসিয়া রঘুনাথ তাঁহার প্রাণারাধ্যের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। সাতদিন প্রভুসহ শান্তিপুরে থাকিবার সৌভাগ্য পাইলেন। কিন্তু এখন তাঁহার দিবারাত্র একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল—কি প্রকারে তিনি রক্ষকের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। আর কি করিয়াই বা নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সেবা করিবেন। অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ যিনি অন্তরের অন্তস্তলেই আছেন, অন্তরের ভাব সবই তিনি জানেন, কারণ—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" সেই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মহাপ্রভু আজ রঘুনাথের মনের কথা সবই বুঝিলেন।

মহাপ্রভুর উপদেশ

রঘুনাথকে সান্ত্বনা দিয়া তদুপলক্ষে মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের জন্য অমূল্য উপদেশ দিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল ॥

'মর্কট-বৈরাগ্য' না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২৩৭-২৩৯)

মহাপ্রভুর এই উপদেশ ভক্তিপথের পথিক যাঁহারা, তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অস্থির হইলেই ত' আর শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে না? তিনি ত' আর আমার অধীন বস্তু নন? আন্তরিক সাধনা করিতে করিতে ক্রমে এই ভবসিন্ধু পার হইলে, তাঁহাকে লাভ করা যায়। তিনি নিজেই ধরা দেন। আর একটি অতি মূল্যবান্ উক্তি করিলেন—'মর্কট-বৈরাগ্য'। যাহা কেবলমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের অভিনয় মাত্র করি এবং মালা-তিলক ধারণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেকে একজন ভক্ত বলিয়া প্রচার করি। এখন, ভক্ত হইতে হইলে বৈরাগ্য দেখাইতে হইবে। কাজেই বাহিরে ত' আমার ভীষণ বৈরাগ্য —সব কিছু ভোগের বস্তুই আমি ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু এদিকে ভিতরে আমার যে কি অবস্থা, তাহা আমি ত' সবই জানি। কামনা-বাসনায় অন্তর একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া আছে! ইহা কি কেবলমাত্র নিজেকে ঠকান নয়? এইরূপ কপটতা সাধকের অধঃপতনের প্রধান কারণ। ইহা ভক্তিপথের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই আজ মহাপ্রভু বানরের বৈরাগ্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে বানরের খুব বৈরাগ্য—সাত্ত্বিক প্রকৃতি—শুধু ফলমূল ভোজী, পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন নাই—গাছতলায় বাস করে, অতি শান্ত শিষ্ট, কিন্তু ভোগের বস্তু পাইলেই হয়, তৎক্ষণাৎ আর কাল-বিলম্ব নাই, অমনি লইয়া পলায়ন। আমাদেরও এই একই অবস্থা। সুতরাং এই লোকদেখান 'বাঁদুরে-বৈরাগ্য' করিয়া সাধনপথে

অগ্রসর হওয়া যায় না। ইহা ক্রমে ক্রমে যশঃ ও প্রতিষ্ঠার জন্য চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করিয়া তোলে। পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

এই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা ভক্তিপথের সম্পূর্ণ বিঘাতক। এক কথায় বলিতে গেলে, কৃত্রিমতার কোন প্রকার স্থান ভক্তিরাজ্যে নাই। কৃত্রিমভাব বেশী দিন রক্ষাও করা যায় না।

বিষয়াদি ভোগও অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্যভাবে করিতে তিনি আদেশ করিলেন—

"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

এইরূপ যুক্তবৈরাগ্যের বিচার বরণ ও ফল্গু-বৈরাগ্যের বিচার গর্হণ করিয়া যথাযোগ্য-বিষয় ভোগ করিতে হইবে। ভক্তিঅনুকূল-ভাব গ্রহণ ও ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জ্জন করিতে হয়। সাধারণতঃ মানব-সমাজে যেরূপ ব্যবহার সুষ্ঠু বলিয়া বিশ্বাস করে, সেইরূপ ব্যবহার লোকসমাজে দেখাইয়া হৃদয়ে প্রাকৃত বস্তুসমূহের অভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানে নিষ্ঠা রাখিয়া ভক্তি করিতে হইবে। এইরূপ নিষ্কপট হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা হইতে থাকিলে কৃষ্ণই জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা বা তৃষ্ণা ত্যাগ পূর্ব্বক অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিলেন।

করুণাময় শ্রীভগবানেরও তাঁহার ভক্তের জন্য প্রাণ আকুল। তিনি প্রেমোন্মত্ত শ্রীল রঘুনাথকে কত প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন। এদিকে আবার সাধন-পথের পথিকদেরও শিক্ষা দেওয়া হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বোধহয় আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি

একাকী শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিবেন। এদিকে শ্রীমদ্ রঘুনাথ এই সময়ে নীলাচলে গেলে তাঁহার সঙ্গ পাইবেন না। সুতরাং এই সুযোগে তাঁহার পিতা-মাতা এবং স্ত্রীর মনে আস্তে আস্তে একটু সান্ত্বনা জন্মাইয়া তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করাইবেন। শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে সেখানে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিতে আদেশ করিলেন। রক্ষকদের হাত হইতে কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইবেন তাহাও বলিয়া দিলেন। এইজন্য তাঁহার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, এই আশ্বাসও দিলেন। কৃষ্ণই তখন তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধি যোগাইয়া দিবেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে কয়দিন বাঁধিয়া রাখা যায়? সুতরাং তাঁহার কোন ভাবনা করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৬পঃ ২৪০-২৪১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে ছল সেকা'ল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥"

এইবার শ্রীমদ্ রঘুনাথ তাঁহার উপদেশ-বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হইবে। প্রভু সাতদিন শান্তিপুরে ছিলেন। শ্রীল রঘুনাথও সপ্তাহকাল সেখানে থাকিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করিলেন। শ্রীল রঘুনাথও তাঁহার উপদেশানুসারে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

বাহ্য ব্যবহারের পরিবর্তন

শ্রীল রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া যেন সম্পূর্ণ বিষয়ী হইয়া গেলেন, ঠিক বিষয়ীর মতই তাঁহার আচরণ করিয়া বাহিরের বৈরাগ্যভাব

অনেক শিথিল করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অন্তরে বৈরাগ্যের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন নাই। এককথায় তিনি মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে আচরণ করিতেছেন। দেখিয়া সকলেই বেশ আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ পিতা-মাতার ত' কথাই নাই। তাঁহারা মনে করিলেন যে, তাঁহাদের পুত্রের মন এইবার বোধহয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার আচার-ব্যবহার এবং বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন, রঘুনাথের বৈরাগ্যভাব শিথিল হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এখন আর প্রহরী রাখার দরকার নাই বলিয়া মনে করিলেন।

"দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ২৪৪)

কিন্তু হায়! এই প্রেমিক ভক্তের অন্তরের ভাব ত' কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অন্তর যাঁহার প্রকৃতই ভগবানের জন্য কাঁদে, তাঁহাকে কি আর বিষয়ে জড়াইতে পারে? এ শুধু তাঁহার আরাধ্যদেবের আদেশ পালন আর সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করা, কবে তিনি কৃপা করিবেন! তাঁহার বৈরাগ্যময় পবিত্র চিত্ত কিছুতেই সংসারে আসক্ত হইল না; তবে বাহ্য ব্যবহারে পিতা-মাতার আন্তরিক সন্দেহ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র স্নেহের সন্তানকে আর হারাইবেন না, ইহা মনে করিয়া অনেক দিনের দুশ্চিন্তা হইতে শান্তি লাভ করিলেন। এখন বেশ আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য, ৬পঃ ১৪-১৫)—

"প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হইলা 'বিষয়ী-প্রায়'॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব-কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন॥"

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। শ্রীল রঘুনাথ অপেক্ষা করিতেছেন—কবে প্রভুর পুরীতে আগমনের সংবাদ পাইবেন, নিরন্তর মনে মনে সেই কথাই স্মরণ করিতেছেন—"শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিলেই তুমি আমার নিকট যাইবে।" যাহা হউক শ্রীল রঘুনাথের সেই শুভদিনের উদয় হইল। তিনি একদিন সংবাদ পাইলেন—তাঁহার আরাধ্যদেব নীলাচলে ফিরিয়াছেন। তাঁহার মন আবার বিচলিত হইয়া উঠিল। কি উপায়ে তাঁহার (মহাপ্রভুর) শ্রীচরণে উপস্থিত হইবেন, পুনরায় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিষয়ে বিপদ্

এদিকে আবার এক ভীষণ দুর্ঘটনা দেখা দিল। জড়বিষয় প্রকৃতই বিষময়, শ্রীল হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসের সংসারে ভয়ানক গোলমাল দেখা দিল। দুইভাই ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন। (শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্য, ৬পঃ ১৭-১৯)—

"হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় 'চৌধুরী'॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি' করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে 'তুরুক্' কিছু না পাইয়া হৈল প্রতিপক্ষ॥"

কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি একটি পরগণা। আবার কতকগুলি পরগণা লইয়া একটি মুলুক। সপ্তগ্রাম মুলুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন মুসলমান। তাঁহারা, প্রজা-স্থানে যে কর আদায় হইত, তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া মালিকের কাজ করিতেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে 'চৌধুরী' বলা হইত। কিন্তু কালক্রমে তাহা হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

শ্রীল হিরণ্য দাস তখন মুলুকের শাসনকর্ত্তা হইয়া কর আদায়ের কার্য্য স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। প্রজা উৎপীড়ন না করিয়া তাঁহারা বিশ লক্ষ টাকা আদায় করিতেন। রাজাকে এই টাকার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্ত্তে বার লক্ষ দেওয়ায় সেই 'তুরুক্' অর্থাৎ মুসলমান স্বীয় প্রাপ্য লাভাংশে বঞ্চিত হইয়া গেলেন। প্রথমতঃ বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে চ্যুত হইলেন, তাহার উপর আবার আয়ও কমিয়া গেল। সুতরাং এতদিনে তাঁহারা দাস ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিরোধী হইলেন এবং বাদসাহের নিকট নালিশ করিয়া তাঁহাদের বন্দী করিতে কিছু সৈন্যসহ একজন উজীর আনিলেন। তাঁহারা হঠাৎ আসিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এদিকে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস পলাইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে না পাইয়া তাঁহারা রঘুনাথকেই বাঁধিয়া আনিলেন।

"রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্য দাস পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ২০)

রঘুনাথকে যে বাদ্‌সাহ ধরিয়া আনিবেন, ইহা তাঁহারা মনে ভাবিতে পারেন নাই। যাহা হউক, রঘুনাথ এইজন্য একটুও বিচলিত হইলেন না। তিনি সংসারে যে যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তাহার তুলনায় এই বন্ধন কিছুই নহে। অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে যিনি শরণাগত, সেই শ্রীচরণারবিন্দই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল, তাঁহার ভয় করিবার কোন হেতুই নাই। তিনি নির্ভীক ও প্রশান্ত-চিত্ত। বাদ্‌সাহের লোকেরা রঘুনাথকে কারারুদ্ধ করিয়া নানা প্রকার উৎপীড়ন করিতে লাগিল। বাপ, জ্যেঠা কোথায় আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিত এবং না বলিলে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে বলিয়া শাসাইত।

কিন্তু ভক্ত রঘুনাথ নীরব—শুধু ভগবৎচিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। সেই পাষণ্ডের দল তাঁহাকে মারিতে যায়—পারে না মারিতে। তাঁহার শরীরে দিব্য-জ্যোতিঃ, মুখে মধুরহাসি, ভগবৎ-প্রেমে চক্ষু ঢুলু-ঢুলু, আহা! এমন শ্রীঅঙ্গে কে আঘাত করিবে? স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার রক্ষা-কর্ত্তা। ম্লেচ্ছ উজীরের ত' আর এই অনুভূতি নাই। তিনি জানিতেন, শ্রীরঘুনাথ একজন গণ্যমান্য ধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতি-প্রধান কায়স্থ বর্ণে জাত, সুতরাং তাঁহাকে মারা উচিত নহে। তবে মুখে খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন।

"মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জে-গর্জে, মারিতে সভয় অন্তর॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ২২-২৩)

এইভাবে আর সময় নষ্ট না করিয়া রঘুনাথ মনে মনে একটা উপায় স্থির করিলেন। ম্লেচ্ছের সঙ্গে বিনয়-নীতি অবলম্বন করিয়া দেখা যাক্ এই কলহের কিছু অবসান হয় কি না। তাই একদিন তিনি সেই ম্লেচ্ছ চৌধুরীকে বলিলেন—"হুজুর! আপনাকে আমার একটা প্রার্থনা শুনিতে হইবে, আমার পিতা এবং জ্যেঠা আপনারই দুই ভাই। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কখনও কলহ, আবার কখনও বা প্রীতি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কলহ চলিতেছে, কিন্তু দুই দিন বাদেই আবার সদ্ভাব হইবে। তবে অনর্থক দীর্ঘকাল এই মনোমালিন্য রাখিবার কি প্রয়োজন? আমি যেমন আমার পিতার স্নেহের সন্তান, আপনারও ত' তদ্রূপ স্নেহের পাত্র আমি? পিতার ন্যায় আপনিও আমার পালক। পালক হইয়া পাল্যকে তাড়না করা শোভা পায় না। আপনাকে আমি 'জিন্দাপীর' বলিয়া মনে করি। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ

আপনি যদি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন, তবে আমাকে স্নেহ করিবে কে ?"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬পঃ ২৪-২৮) আছে—

"তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায়।
বিনতি করিয়া কহে, সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥
'আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা এক-ঠাঞি॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান 'জিন্দাপীর'-প্রায়'॥"

একে রঘুনাথের স্নিগ্ধ, কোমল ও প্রেমভক্তিপূর্ণ শ্রীমুখের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহার উপর তাঁহার সুমধুর ভাষা। সেই ভাষাও বিনয়-নম্রতা মাখান। সর্ব্বাপেক্ষা রঘুনাথের সরল শান্ত ভাষার আকর্ষণী শক্তিতে ম্লেচ্ছের হৃদয়ে বাৎসল্য-ভাবের উদয় হইল। রঘুনাথের করুণ-বাক্যে তাঁহার চিত্ত একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। বাৎসল্য-ভাবের আবেগে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। এইবার তিনি রঘুনাথের কথার উত্তর দিলেন—"সত্যই রঘুনাথ, তুমি আমার পুত্রতুল্য। আজই তোমাকে আমি মুক্তি দিতেছি। তবে একটা কথা এই, তোমার জ্যেঠা এত স্বার্থপর যে, ২০ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় করিয়া ১২ লক্ষ রাজাকে দেন, বাকী ৮ লক্ষ নিজেরা আত্মসাৎ করেন। আমি কি তাহার ভাগ কিছুই পাইব না ? তুমি বাড়ী যাও, তোমার জ্যেঠাকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পাঠাইয়া দিও। তাঁহার উপরই আমি

সব ভার দিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করুন। আমার বলিবার আর কিছুই নাই।" ইহা বলিয়া তিনি রঘুনাথকে মুক্তি দিলেন। রঘুনাথও বাড়ী ফিরিয়া জ্যেঠাকে সব বলিলেন এবং তাঁহাকে মুসলমান চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথের চেষ্টায় এতদিনে সমস্ত কলহের অবসান হইল। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ২৯-৩৪)—

"এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হইল।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল॥
ম্লেচ্ছ বলে,—"আজি হৈতে তুমি—মোর 'পুত্র'।
আজি ছাড়াইমু তোমা' করি এক সূত্র॥"
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥
"তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলুঁ তোরে"॥
রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল—সব শান্ত হৈল॥"

রঘুনাথের দ্বারা এই বিপদ্ প্রশমন করাও শ্রীভগবানের আর একটি খেলা। এইসব গোলযোগ শান্ত হইতে তাঁহার আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক্ষণে রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-দর্শনের জন্য পুনরায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তথাপি তখনও তিনি মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ পলাইবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু পিতার নিকট হইতে কিছুতেই মুক্তি পাইতেছেন না। যতবার পলাইতে যান, ততবারই পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেছেন। একদিন রঘুনাথের মাতা তাঁহার পিতাকে

বড়ই দুঃখের সহিত বলিলেন— "পুত্র 'বাতুল' হইল রাখহ বান্ধিয়া।"

গোবর্দ্ধন মজুমদার সবই বুঝিতে পারিতেছেন, তিনি উত্তর দিলেন—(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ৩৯-৪১)

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?"

অর্থাৎ ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য এবং ঘরে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যাহার মন আকৃষ্ট হয় না, তাহাকে কি আর সামান্য দড়ির বাঁধনে বাঁধিয়া রাখা যাইবে? ইহা তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। জন্মদাতা পিতারও ইহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। তাহার উপর আবার উহার প্রতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে। ভগবানের জন্য যাহার মন পাগল, তাহাকে কে আটকাইয়া রাখিতে পারে? কোনপ্রকারেই তাহাকে আর বাঁধা যাইবে না।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাভিক্ষা ও পানিহাটির মহোৎসব

রঘুনাথ এইভাবে বার বার ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় তিনি একটু স্থির হইয়া ভালভাবে চিন্তা করিলেন। হয়ত কোন ত্রুটীর জন্য তাঁহার এই বাধা আসিতেছে। এইবার তাঁহার মনে হইল, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার মনোহভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরণ-দর্শনে চলিলেন।

চৈত্য-গুরু-রূপে শ্রীল রঘুনাথের অন্তরে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই এই প্রেরণা দিয়া তদ্দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাব্যতীত শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায় না। অর্থাৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে হয়। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব,—শ্রীনিত্যানন্দেরই অভিন্ন প্রকাশস্বরূপ। তাঁহার কৃপায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও শ্রীভগবানের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান্ ত' আর কাহারও ইচ্ছাধীন বস্তু নন, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম, সুতরাং নিজের খেয়ালমত তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছান' যায় না। 'গুরুরূপে কৃষ্ণ, কৃপা করেন ভক্তগণে'।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করিয়াছেন—

"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৪)—

"জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥"

এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর রাঘব পণ্ডিতকে যে গুহ্য উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।১০১)—

"রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই॥"

সুতরাং অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ভিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে প্রেরণা দিলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দপ্রভু পার্ষদগণ লইয়া গৌড়দেশে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কহিয়াছিলেন—

"এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন॥"

মহাপ্রভুর এই মনোহভীষ্ট শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু অনতি-কালবিলম্বে নিজগণসহ গৌড়দেশে চলিলেন—

"আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই' নিজগণে॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।২২৮-২৩০)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে) আসিয়া যেরূপ প্রেমানন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই সময়ে তিনি তিনমাসকাল পানিহাটীতে অবস্থান করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন। গ্রামখানিকে তিনি বৈষ্ণবের পবিত্রতীর্থে পরিণত করিয়া ফেলিলেন এবং প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিলেন। ভক্তগণ যেন গোলোকের সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কারণ, "গোলোকের প্রেম-ধন, হরিনাম-সংকীর্ত্তন"। একমাত্র ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত এই প্রেমানন্দ সুখ কে উপলব্ধি করিবে? আমার মত ভগবদ্‌বিমুখের তাহাতে কি অধিকার? শ্রীমদ্ বৃন্দাবন

দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে সেই লীলার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন, যথা (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫ম ৩১৯-৩২১)—

"এইরূপে পানিহাটী-গ্রামে তিনমাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কা'রে নাহি স্ফুরে॥
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম-সুখে নৃত্য বই নাহি আর॥"

এদিকে শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে পানিহাটীর এই আনন্দোৎসবের সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন একেবারে বালক নন। সম্পত্তির ভার তাঁহার উপর ছিল। সুতরাং বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া তিনি সেই উৎসব দর্শন করিতে চলিলেন।

সপ্তগ্রাম হইতে পানিহাটী খুব বেশী দূর নয়। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে কীর্ত্তনের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কীর্ত্তন-যজ্ঞের বেদী-মূলে আসিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন! এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত এক বেদী, সেখানে এক অপূর্ব্ব মহাতেজোময় অবধূত মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। এই বটবৃক্ষ এবং বেদী এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাকে ঘেরিয়া বহু ভক্ত ও কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া রঘুনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দূর হইতেই তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে এই গ্রামখানিও সপ্তগ্রাম মুলুকের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং তাঁহাকে সকলেই চিনিতেন। প্রণত রঘুনাথকে দেখাইয়া একজন ভক্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,— "প্রভো! ঐ দেখুন, রঘুনাথ উপস্থিত এবং আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন।"

"তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটি-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু,—যেন সূর্য্যোদয় ক'রে॥
তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি' প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ—বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে।
সেবক কহে,—'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ৪২-৪৬)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাকাইয়া দেখেন, রঘুনাথ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় গড়াগড়ি করিতেছেন। তিনি রঘুনাথকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং নিজ-জন-জ্ঞানে কৃপোৎফুল্লচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—

'শুনি' প্রভু কহে,— চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন॥" (ঐ ৪৭)

অন্তর্য্যামি ভগবান্, সকলের অন্তরই তিনি জানেন। তাঁহার নিকট লুকাইবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি ভাষাগ্রাহী নন, ভাবগ্রাহী, সুতরাং রঘুনাথের অন্তরের খবর তিনি সবই জানেন। তাই 'চোরা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহার অন্তর কৃষ্ণভক্তিময় ও তীব্র বৈরাগ্যশীল, তথাপি বাহিরে প্রেমভক্তির আবেগ সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। অন্তরের ভাব লুকাইয়া ফেলিয়াছেন, তাই তিনি প্রভুর নিকট 'চোরা' বলিয়া আখ্যা পাইলেন। কিন্তু তবুও তিনি নিকটে গেলেন না। তিনি নিজেকে অতি দীন মনে করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 'তিনি সংসারী কীট, কি প্রকারে প্রভুর নিকট যাইবেন?'—তাঁহার অন্তরে

এইরূপ বৈষ্ণবোচিত নানাপ্রকার দৈন্যভাবের উদ্গম হইতে লাগিল ; কিন্তু 'প্রেমে-মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার', তিনি তাঁহাকে নিজ নিকটে টানিয়া আনিয়া স্বীয় 'কোটিচন্দ্র-সুশীতল' চরণকমল তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন। সাধারণ জীব ত' দূরের কথা, ব্রহ্মাদি দেবতারও কি এমন সৌভাগ্য হয় ? তবে রঘুনাথ ত' আর প্রাকৃত-জীব নহেন? তিনি শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ, সাধারণ জীব-জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই আজ তিনি এই সাধনাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। রঘুনাথ প্রেমময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ-কমল-স্পর্শে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কৌতুকী নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিয়া কৌতুক সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"প্রভু বোলায়, তেঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে প্রভু ধরিলা চরণ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে —দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয় ॥
'নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে'।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ৪৮-৫১)

নিত্যানন্দ প্রভু পুনঃ পুনঃ রঘুনাথকে "চোরা" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন। আহা, সত্যই ইহা অতি আদরের সম্বোধন ! পরম দয়াল নিত্যানন্দ বড়ই কৌতুকী। 'চোর' শব্দের অর্থ—যে পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করে এবং লুকাইয়া রাখে। ইহা ত' সাধারণ প্রাকৃত-জগতের চোর, পরন্তু রঘুনাথ হইলেন—অপ্রাকৃত-জগতের অপ্রাকৃত-'চোর'। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি তাঁহার অন্তরের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস এবং বৈরাগ্যের অভিব্যক্তি—সব লুকাইয়া সাধারণ

একজন বিষয়ীর মতই বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু প্রেমভক্তির মালিক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন-শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত ইহা ত' কেহই লাভ করিতে পারে না; রঘুনাথ যে তাঁহার অতি নিজজন, তাহা সত্ত্বেও তিনি ধরা দিতেছেন না, দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। তাই প্রেমভক্তি-চোরা রঘুনাথকে তিনি অতি শুভ দণ্ড দিলেন—

"দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।"

এই দণ্ড মহোৎসবের লীলার মাধ্যমে তিনি আর একটি শিক্ষা দিতেছেন—অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর গুরু-বৈষ্ণবের সেবায়ই অর্থাদি নিয়োগ দ্বারা অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় এবং বিত্তশাঠ্য-রূপ অনর্থনাশ ও নিত্যমঙ্গলের উদয় হইয়া থাকে। আর বৈষ্ণব-সেবাই যে ভগবৎকৃপালাভের প্রধান উপায়, তাহাও তদ্দ্বারা শিক্ষা দিলেন।

রঘুনাথ এই দণ্ডকে প্রভুর পরম অনুগ্রহ-জ্ঞানে পরমানন্দে মাথা পাতিয়া লইলেন। অতিশয় আনন্দিত চিত্তে তিনি এই শুভ মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাংসারিক জীবনে এই একটি মাত্র শুভ-কার্য্যের সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র রঘুনাথ গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া দিলেন দ্রব্যাদি আনিবার জন্য। তিনি সেই মুলুকের মালিক, সুতরাং তাঁহার আদেশ পাওয়া মাত্র চারিদিকেই লোক চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে দধি, দুগ্ধ, চিনি, চাঁপাকলা এবং মাটির পাত্র ইত্যাদি ভারে ভারে প্রভুর সম্মুখে আনিয়া রাখা হইল। এদিকে মহোৎসবের নাম শুনিয়া অসংখ্য লোক এবং ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণও দলে দলে আসিতে লাগিলেন। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ৫৪-৫৫)—

" 'মহোৎসব'-নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন॥

আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই-চারি হোল্‌না আনাইল ॥"

এদিকে ব্রাহ্মণগণ ভোগের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইভাগ করিয়া চিড়া ভিজান হইল। এক ভাগ জলে, অপর ভাগ গরম দুধে। জলে ভিজান' চিড়া দধি, চিনি ও কলা দিয়া মাখান হইল, আর দুধে ভিজান' চিড়া ঘন দুধ, চাঁপাকলা, চিনি মাখিয়া তাহার মধ্যে উত্তম গব্যঘৃত ও কর্পূর দেওয়া হইল। দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মালসায় মালসায় সাজান হইয়া গেল।

ধুতি পরিধানে নিত্যানন্দ প্রভু বেদীর উপরে একটী পিঁড়ায় ('পিণ্ডা' অর্থাৎ পিঁড়ি বা আসন) বসিলেন। রামদাস (ঠাকুর অভিরাম), সুন্দরানন্দ, দাসগদাধর, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি যত ভক্ত—সকলেই চাতালে বসিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আদর করিয়া উপরেই বসান' হইল। অন্যান্য লোকসমূহ চাতালের নীচে সমতল জায়গায় বসিলেন। স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় গঙ্গা-তীরে, এমন কি গঙ্গাজলের মধ্যেও বহু লোক প্রসাদ পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রত্যেকের জন্যই দধি-চিড়া এবং দুগ্ধ-চিড়া এই দুই প্রকার মালসা সাজান' হইল। কুড়িজন লোক পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গেলেন। প্রথমে প্রভুকে এবং পরে ভক্তগণকে পরি-বেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠিক এমন সময় পরমপ্রেমিক ভক্ত রাঘব পণ্ডিত নানাপ্রকার নিসকড়ি-প্রসাদসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অগ্রে নিত্যানন্দপ্রভুকে, পরে সকল ভক্তকে তাহা বণ্টন করিয়া দিলেন। এই ভক্তের গৃহেই মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব, নিত্যানন্দপ্রভুও এখানে থাকিতেন। রাঘব পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব দণ্ড-মহোৎসব-লীলা দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত

হইয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যে অদ্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সেবা করিবার কথা, আর এখানে মহোৎসবের এই কি বিরাট্ আয়োজন! তিনি প্রভুকে তাঁহার গৃহে ভোজনার্থ অনুরোধ করিয়া কহিলেন—"প্রভো, ঘরে আপনার জন্য ভোগ লাগাইলাম; প্রসাদ প্রস্তুত রহিল, আর আপনি এখানে এই উৎসব করিতেছেন? এ কি ব্যাপার?"

প্রভু উত্তর দিলেন—"এখানে দিনে ভোজন করি, রাত্রিতে তোমার ঘরে ভোজন করিব। আর একটি কথা কি জান? —আমি গোপ-জাতি, আমার সঙ্গে যাহাদের দেখিতেছ ইহারাও গোপ। পুলিন-ভোজনে আমার বড় সুখ হয়।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য ৬।৭৫) আছে—

গোপ-জাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজনরঙ্গে।"

এই বলিয়া রাঘব পণ্ডিতের সম্মুখেও দুই খানা মৃৎকুণ্ডিকা অর্থাৎ মালসা দেওয়াইলেন। সকলের সামনেই প্রসাদ-পূর্ণ পাত্র। সেই সময়ে দয়াল নিতাই ধ্যানযোগে মহাপ্রভুকে আনিলেন। অন্তর্য্যামি-প্রভু শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপে শুভাগমন করিলেন।

মহাপ্রভুর আগমনে নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রত্যেক স্থালীর নিকটে গিয়া এক এক গ্রাস তুলিয়া তুলিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখমণ্ডলে দিতে লাগিলেন। আবার মহাপ্রভুও হাসিয়া হাসিয়া এক এক গ্রাস চিড়া তুলিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখে দিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের এই লীলা সকলের সম্মুখেই হইতে লাগিল, কিন্তু সকলের ত' আর ইহা দৃষ্টিগোচর হইল না! মাত্র দুই একজন ভাগ্যবান্ ভক্তের নিকট এই লীলা-রহস্য প্রকাশিত হইল। তাই

মহাজন-বাক্য—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"

ইহাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু সন্দিগ্ধচিত্তজনগণকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যথা, (চৈঃ চঃ অ ৬।১২৪-১২৫)—

"ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥
সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥"

যাহা হউক নিতাইর রঙ্গ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তিনি যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি করিতেছেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তবে সুকৃতি-সম্পন্ন দুই একজন ভক্ত মাত্র এই অলৌকিক ব্যাপার উপলব্ধি করিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই লীলা-রহস্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ৭৭-৮২)—

"সকল-লোকের চিড়া যবে পূর্ণ হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥
সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥
হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
এইমত নিতাই বুলে সকল-মণ্ডলে।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥

কি করিয়া বেড়ায়, —ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥"

এইবার নিত্যানন্দ প্রভু আসনে বসিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে মহাপ্রভুর আসন পাতা হইল। তাঁহার পুরোভাগে চারি মালসা 'আরোয়া' অর্থাৎ আতপ-চিড়া মহাপ্রভুর জন্য রাখিলেন। অপরের অগোচরে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া হইল। এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি দিয়া প্রসাদ-সেবা করিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দুইভাই মহানন্দে চিড়া-ভোজনলীলা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে তখন তুমুল হরিধ্বনি উঠিল। ভক্তগণ প্রেমানন্দে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সকলেরই হৃদয়ে আজ ব্রজের পুলিন-ভোজন-লীলার উদ্দীপন হইল। শ্রীল রামদাসাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরকে যমুনা-পুলিন মনে করিলেন। ব্রজলীলায় শ্রীভগবানের এই পুলিন-ভোজনলীলা দেখিয়া ব্রহ্মাও মোহিত হইয়াছিলেন, আজ শ্রীল রঘুনাথের ভাগ্যে ভক্তগণের হৃদয়ে পুনরায় সেই লীলার উদ্দীপনা। তাঁহার উপর প্রভুদ্বয়ের বড়ই করুণা।

মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে পণ্য-বিক্রয়কারীর দল যত চিড়া, দধি সন্দেশ, কলা প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আসিতে লাগিল, সবই এই উৎসবে যথোচিত মূল্য দ্বারা কিনিয়া রাখা হইতেছে। আবার প্রসাদ করিয়া তাহা তাহাদিগকেও খাওয়ান হইতেছে। প্রসাদ না পাইয়া কেহই ফিরিয়া যাইতেছে না। যত যত লোক এই মহোৎসব দর্শন করিতে আসিল, সকলকেই প্রসাদ দিয়া তৃপ্ত করা হইল। ক্রমে ক্রমে নিত্যানন্দ প্রভুর ভোজন হইয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভুক্তাবশেষ আনিয়া শ্রীল রঘুনাথকে দেওয়া হইল, বাকি অবশেষ যাহা ছিল, তাহা অন্যান্য ভক্তগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর মাল্য-চন্দনে প্রভুকে সাজান' হইল এবং কোন এক সেবক কর্ত্তৃক আনীত তাম্বূল প্রভু

চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। মালা, চন্দন এবং তাম্বূলের অবশেষ যাহা ছিল, প্রভু নিজের হাতে আবার তাহা সকলকে বিতরণ করিলেন। প্রভুর অবশেষ পাইয়া রঘুনাথ অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে দয়াল নিতাই এই দণ্ড-মহোৎসব-লীলা সম্পন্ন করিলেন। ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 'চিড়া-দধি-মহোৎসব'-নামে বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-কৃত এই চিড়া-দধি-মহোৎসব শ্রীপাঠ পানিহাটী গ্রামে সু-সম্পন্ন হয়। সেই তিথি অনুসরণ করিয়া আজও গঙ্গাতীরে সেই বাঁধান' বটবৃক্ষের মূলে সেই উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দের নিকট ইহা একটি মহাপবিত্র তীর্থস্থান।

এইভাবে আনন্দের সহিত সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রেমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভুও সেই নর্ত্তন-কীর্ত্তনানন্দ দর্শন করিতে আসিলেন। কিন্তু ইহা শুধু নিত্যানন্দ প্রভুই অনুভব করিলেন।

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৩৪-৩৫

(১) "শ্রীশচীর গৃহমন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে, (৩) শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘবভবনে,—এই চারিটী স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন।" (অনুভাষ্য)। যে নৃত্য দর্শন করিতে স্বয়ং মহাপ্রভুর আগমন, তাহার মাধুর্য্য বর্ণনা করা মাদৃশ অধমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর ভোগের আয়োজন

হইল। এইবারও মহাপ্রভুর ভোজনাসন নিত্যানন্দ প্রভুর দক্ষিণে দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার আগমন কেবল নিত্যানন্দ প্রভু এবং রাঘব পণ্ডিতেরই দৃষ্টিগোচর হইল। আর অন্যান্য সকলের নিকট তিনি অদৃশ্য রহিলেন। রাঘব পণ্ডিত, প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত অপর ভোজ্য গ্রহণ করিতেন না। ইহার পূর্ব্বেও মহাপ্রভু বার বার তাঁহার গৃহে ভোজন উপলক্ষে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। কারণ তাঁহার প্রেমসেবায় প্রেমবশ্য মহাপ্রভু বড়ই তৃপ্ত হইতেন। নানাপ্রকার পিঠা, পায়স এবং ব্যঞ্জনাদি-বৈচিত্র্যসহ সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ। আহা! যেন স্বয়ং শ্রীরাধাঠাকুরাণীর শ্রীহস্ত-পাচিত দ্রব্য! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬।১১৫-১১৭) বর্ণিত আছে,—

"কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার॥"

দুই ভাই এর ভোজন সমাপ্ত হইল। রাঘব পণ্ডিত পরমপ্রীতি-ভরে তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বৈষ্ণব-গণেরও ভোজন সম্পন্ন হইল। ভোজনান্তে মহা হরিধ্বনি উত্থিত হইল। দুই ভাইকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার মাল্য-চন্দনে সাজান' হইল। এইবার পরম দয়াল রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের অবশিষ্ট পাত্র তাঁহাকে দিলেন। বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত সেই প্রসাদ পাইয়া রঘুনাথের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। রঘুনাথকে রাঘবপণ্ডিত আশ্বাস দিলেন,—"শ্রীভগবানের অবশেষ পাইয়াছ, এইবার তোমার বন্ধন ঘুচিবে।" ভক্তের চরিত্র আলোচনা করিলে প্রতিপদে-পদেই বহু শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়; কিন্তু

হতভাগ্য আমরা তাঁহাদের শিক্ষার দিক্‌টা কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহি না। এখানে পরিষ্কারভাবেই শিক্ষা দিতেছেন যে, গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত কোনক্রমেই সংসারবন্ধন খণ্ডিত হয় না। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

এই দুই মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া পরদিন প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় গঙ্গাতটবর্ত্তী সেই বৃক্ষের তলে নিজগণসহ আসিয়া বসিলেন। রঘুনাথ আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। রাঘব পণ্ডিত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকট রঘুনাথ তাঁহার মনের ইচ্ছা সমস্তই বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছি না; আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার মনঃকথা প্রভুর নিকট নিবেদন করুন।" তচ্ছ্রবণে শ্রীরাঘবপণ্ডিত পরম প্রীতিভরে রঘুনাথের মনের কথা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিবেদন করিলেন। কহিলেন,—প্রভো, রঘুনাথ আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছে—

"অধম, পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়, —পাঙ চৈতন্য-চরণ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা, দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ', গোসাঞি, হঞা সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ!
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ' কর আশীর্ব্বাদ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ১২৮-১৩৩)

শ্রীল রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-চরণ-লাভের আশায় বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সদ্‌গুরুকৃপা ব্যতীত কোন-ক্রমেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছান' যায় না। একমাত্র পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কৃপাতেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং জগদ্‌-গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-চরণ কিরূপে লাভ করিবেন? তাই তিনি প্রভুর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন—"আমি অধম, পামর এবং নিতান্ত অযোগ্য, বামন যেমন চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা করে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করে, আমারও তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-চরণ পাইবার জন্য দুর্ল্লভ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। কতবার কতপ্রকার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই একটা না একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। কিছুতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। প্রভো! আমি এখন বুঝিয়াছি যে, আপনার কৃপা না হইলে আমি আমার নিজের চেষ্টায় তাহা কিছুতেই লাভ করিতে পারিব না। আপনার কৃপাতেই অতি অযোগ্য ব্যক্তিও সেই শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীচরণ অতি সহজেই লাভ করিতে পারে। আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবার যোগ্যতা আমার বিন্দুমাত্রও নাই, তাই মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে ভয় হয়। তবে আপনি যে পরম দয়াল, পরম করুণাময়—এই ভরসায় আবার একটু সাহসও পাইতেছি। প্রভো! দয়া করিয়া আমার মাথায় আপনার শ্রীপাদপদ্ম রাখিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীচৈতন্য-চরণ লাভ করিতে পারি।"

ভক্ত-চরিত্রের প্রধান লক্ষণ দীনতা, তবে তাহা নিষ্কপট হওয়া চাই। রঘুনাথের এই প্রকার দীনতা-পূর্ণ উক্তি সম্পূর্ণ নির্ব্বালীক—স্বাভাবিক। সকল-প্রকার সাধন-পথেই গুরুকৃপা প্রয়োজন, যথা,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" (মুণ্ডক ১।২।১২)

পরমারাধ্য সদ্‌গুরুচরণে শরণাগত হইলে তৎকৃপায় দিব্য ভগবজ্‌জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত ইষ্ট-বস্তু লাভের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। তাই আজ শ্রীল রঘুনাথ জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট তাঁহার সরল হৃদয়ের শুদ্ধ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন।

গৌর-প্রেমের ভাণ্ডারী একমাত্র নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁহার কৃপা ব্যতীত গৌরকৃপালাভের আশা সুদূরপরাহত। তজ্জন্য শ্রীল রঘুনাথ সর্ব্বাগ্রে তাহার শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। পরম দয়াল—পরম করুণাময় প্রভু ভক্তের আর্ত্তি শুনিয়া একটু হাসিলেন। রঘুনাথের শ্রীচৈতন্য-চরণ-লাভের আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভু আজ শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট আবেদন জানাইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"রঘুনাথের বিষয়সুখ দেবরাজ ইন্দ্র-সুখের সমান; কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় সেই সুখ বর্ত্তমানে তাঁহার নিকট অতীব দুঃখ-কর মনে হইতেছে; কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ একবার মাত্রও যে আস্বাদন করে, তাহার নিকট ব্রহ্মলোকের সুখও অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, শ্রীভগবানে রতি জন্মিলে তাঁহার আর এই প্রাকৃত জগতের কোন বস্তুর প্রতিই আসক্তি থাকে না।" রাজা ভরত উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের চরণ অভিলাষী হইয়া যৌবন অবস্থাতেই অতি প্রিয় স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্, রাজ্য প্রভৃতি মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া দয়াল প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ-সহকারে বলিতে লাগিলেন,— (চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৩৯-১৪১)

"তুমি যে করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।

নৃত্য দেখি' রাত্র্যে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥"

এই সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ-সহ আবার ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়া দিলেন— (চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৪২-১৪৩)

"স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥
নিশ্চিত হঞা যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥"

পরম করুণাময় প্রভু, একেবারে সুনিশ্চিত আশ্বাস-বাণী করিলেন—"রঘুনাথ, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। তোমার বন্ধন ঘুচিয়া গেল। তোমাকে তিনি স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিবেন এবং তাঁহার স্বীয় চরণে তোমাকে অন্তরঙ্গ ভৃত্য করিয়া রাখিবেন। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে যাও। শীঘ্রই নিরাপদে শ্রীগৌরসুন্দরের রাতুল চরণ লাভ করিতে পারিবে।" ভক্তগণের দ্বারাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করাইলন। রঘুনাথ সকলেরই চরণ বন্দনা করিলেন। দয়াময় শ্রীগুরুদেব ভিন্ন এমন সুনিশ্চিত আশ্বাস-বাণী আর কেই বা দিবেন? সুতরাং সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত নিঃশ্রেয়স লাভের অন্য দ্বিতীয় কোন পথ নাই। শ্রীগুরুদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের কৃপাই ভগবৎকৃপা—ভগবৎসেবা পাইবার একমাত্র সচ্ছাস্ত্র-নির্দ্ধারিত সুগম পন্থা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল ॥" ইত্যাদি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক বৈষ্ণবসেবায় অধিকার দেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথকে দণ্ডদানের

অভিনয়ে বৈষ্ণবসেবাধিকাররূপ কৃপা বিতরণ করিলেন। রঘুনাথের নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণব-সেবাগ্রহ দর্শনে প্রীত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৌরসেবা-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই শুভ আশীর্ব্বাণী পাইয়া রঘুনাথের চিত্ত—আনন্দে উৎফুল্ল, অতীব প্রসন্ন এবং শান্ত হইল। এইবার তাঁহার হৃদয়ের বহুদিনের সঞ্চিত—পোষিত আশা বলবতী হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি প্রভুকে না জানাইয়া রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রভুর সেবার জন্য একশত মুদ্রা ও সাত তোলা সোনা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে দিলেন এবং তাঁহার নিকট এখন গোপন রাখিয়া পরে প্রকাশ করিতে বলিলেন। তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য মহান্ত ভৃত্য ও আশ্রিত জনগণের প্রত্যেককে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদানুসারে প্রণামী বাবদ দশ, বার, পনের, বিশ, পঞ্চাশ হইতে শতমুদ্রা করিয়া দিবার জন্য রাঘব পণ্ডিতের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন এবং সেইরূপ ব্যবস্থাও করিলেন। শ্রীরাঘবও যাঁহার নামে যত দিতে হইবে তদনুরূপ চিঠি লিখাইলেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকেও রঘুনাথ একশত মুদ্রা ও দুই তোলা সোনা দিয়া প্রণাম করিলেন।

রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া ঠাকুর দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদী মাল্য-চন্দন পরাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বাড়ী ফিরিবার পথে খাইবার জন্য স্নেহ করিয়া বহু প্রসাদও দিয়া দিলেন। এই প্রকারে রঘুনাথ পাণিহাটীর মহোৎসবে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় অকাতরে—সানন্দচিত্তে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তসেবাদ্বারাই যে অর্থশালী বিষয়িগণের কষ্টার্জ্জিত ও সযত্নে সঞ্চিত অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতে পারে, শ্রীরঘুনাথের এই মহদাদর্শ হইতে তাহাই বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। উৎসবের কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইল। শ্রীরঘুনাথ বাঞ্ছাকল্পতরু সপার্ষদ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বাভীষ্টানুরূপ কৃপা পাইয়া পরমানন্দে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ঠাকুরকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এইবার তাঁহার বাহ্য ব্যবহারের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। গৃহে ফিরিয়া তিনি বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর ভিতরে আর যান না। ইহা দেখিয়া রঘুনাথের আপ্তবর্গ অত্যন্ত ভীত হইলেন। পুনরায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা হইল। প্রহরিগণ দিবারাত্র জাগরণ করিয়া রঘুনাথকে পাহারা দিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরণ পাইবার আশায় রঘুনাথের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পলাইবার জন্য তিনি নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পাণিহাটী যাইবার পূর্ব্বে তিনি মহাপ্রভুর আদেশে যথা-যোগ্য বিষয় ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ পাইবার পর হইতেই আবার বিষয়ে তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। এমন কি অন্তঃপুরে যাওয়া পর্য্যন্তও বন্ধ করিয়া দিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬।১৫৫-১৫৬)—

"সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন।
বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে করেন শয়ন॥
তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন॥"

উদ্ধারের উপায়

এমন সময়ে গৌড়দেশের ভক্তগণ সকলেই প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনিও সেই সঙ্গ ধরিবেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল যে, যাত্রীরা যে পথে যাইবেন, সেইপথ ত' সকলের নিকটই পরিচিত, সুতরাং তাঁহাকে প্রহরীরা ধরিয়া আনিতে পারে, এই সঙ্গেও সুবিধা হইবে না।

এইরূপে কি উপায়ে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, রঘুনাথ তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন। অত্যন্ত উদ্বেগে—উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার দিন কাটিতেছে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—প্রপন্নার্ত্তিহর ভগবান্ আর বিলম্ব করিলেন না। এইবার তাঁহার ভক্তকে তচ্চরণে চিরাশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। এতদিনে বুঝি রঘুনাথের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে তিনি শুইয়া আছেন, নিদ্রা ত' নাই, অহর্নিশ 'হা নিতাই, হা গৌর' বলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনিনাদ করিতেছেন, চক্ষুতে শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত —নয়নজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে একদিন শেষ রাত্রে শ্রীমদ্ যদুনন্দন আচার্য্য স্বয়ং রঘুনাথের নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি ছিলেন রঘুনাথের শ্রীগুরুদেব এবং কুল-পুরোহিত। তিনি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরও বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র। গুরু-দেব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের দীক্ষা-শিক্ষানুসরণে তিনি ছিলেন—শ্রীচৈতন্যৈকপ্রাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীবের নিত্য উপাস্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াই বিচার করিতেন। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৫৯-১৬২)—

"এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবী-মণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে॥
দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ॥
বাসুদেব-দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহ হয় 'পুরোহিত'॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ'।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে 'প্রাণধন'॥"

যদুনন্দন আচার্য্য অঙ্গনে প্রবেশ করিতেই রঘুনাথ আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনিও এই শেষ রাত্রিতে কেন আসিলেন, তাহার কারণ প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—রঘুনাথ,

আমার একজন ব্রাহ্মণ শিষ্য আমার গৃহে আমার শ্রীবিগ্রহের সেবা করে ; কিন্তু কি-জানি কেন সে এখন সেবা ছাড়িয়াছে, আমার আর পূজারী ব্রাহ্মণ নাই। তুমি তাহাকে গিয়া বল, সে যেন সেবাকার্য্য পরিত্যাগ না করে। এখনই আসিয়া যেন সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়। পূজারী ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ায়, শ্রীযদুনন্দন রঘুনাথকে দিয়া পূজারীকে সাধাইলেন। ভাবিলেন—রঘুনাথের কথা পূজারী অমান্য করিতে পারিবে না। তাই মঙ্গলারতি সম্পন্ন করাইবার উদ্দেশ্যে, তিনি শেষরাত্রেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই পূজারী শিষ্যের বাড়ী যাইবেন স্থির করিয়া আসিয়াছেন।

"রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক 'ব্রাহ্মণ'॥"

(চৈঃ চঃ অ ৬।১৬৫)

এই কথা বলিয়া রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূজারীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। আচার্য্যের বাড়ী রঘুনাথের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে, আবার তাহার কিছুদূরে পূজারীর বাড়ী। এদিকে প্রহরীর দল রাত্রি শেষে সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যদুনন্দন আচার্য্য শিষ্য রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীল গুরুদেবকে অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ বুদ্ধিমান্ রঘুনাথ গুরুর নিকটে কৃষ্ণভজনার্থ বিদায় আজ্ঞা লইবার সুযোগ করিয়া লইলেন। যথা,—

"অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমা স্থানে॥
তুমি ঘরে যাহ সুখে—মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয়॥" (ঐ ১৬৮-১ ৯)

সরলতার মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেব রঘুনাথের মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি সরল-

ভাবেই নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথ এইবারই পলাইবার উপযুক্ত সময় মিলিয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'না, আর কালবিলম্ব করিব না, এক্ষণে সেবক রক্ষক কেহই আমার সঙ্গে নাই, সুতরাং ইহাই আমার পলাইবার উত্তম সুযোগ।' আহা! অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব যেন তাঁহাকে প্রহরীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই প্রত্যূষে তাঁহাদের গৃহে আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে করিয়াই লইয়া চলিলেন।

সংসার হইতে মুক্তিলাভ

"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত' প্রসঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ অ ৬।১৭০)

মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া রঘুনাথ পূর্ব্বদিকে রওনা হইলেন। পিছনে চাহিয়া দেখেন, কেহই নাই। এতদিনে রঘুনাথ তাঁহার ইষ্টদেবের শ্রীচরণে নিজেকে উৎসর্গ করিবার সুবর্ণসুযোগ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অভয়চরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার সোজা পথে গেলেন না—পাছে ধরা পড়িয়া যান। পথ ছাড়িয়া উপপথে চলিতে লাগিলেন। রাজপুত্র তিনি, জীবনে কখনও কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই, কিন্তু আজ শ্রীভগবানের চরণ পাইবার আশায় রঘুনাথ সকল পথকষ্ট বিস্মৃত হইয়াছেন—অম্লানবদনে পদব্রজে প্রকাশ্য সদর পথ ছাড়িয়া কত বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া ছুটিতেছেন। কোথাও বা আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন আবার কোথায়ও বা হোঁচট্ খাইয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছেন! কণ্টকাকীর্ণ পথে কণ্টকে তাঁহার সুকোমল

দেহ ও সুকোমল চরণকমল হইতে কত রক্তোদ্গম হইতেছিল, কিন্তু আহা! শ্রীগৌরগত প্রাণ রঘুনাথের আজ আর সেদিকে কোন দৃক্‌-পাতই নাই। কোন প্রকার পথক্লেশই তাঁহার আর অনুভূতির বিষয় হইতেছে না। ক্ষুধাতৃষ্ণাও তাঁহাকে কিছুমাত্র অভিভূত করিতে পারিতেছে না। একমাত্র চিন্তা তাঁহার ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্ম, আর ত্রাস যে ধরা পড়িয়া না যান—অভীষ্টসিদ্ধিতে—শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তিতে কোন বিঘ্ন না ঘটে! তাই জল, জঙ্গল, কণ্টক ও উত্তপ্ত বালুকাভূমির উপর দিয়া রঘুনাথ উন্মাদের মত অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ছুটিয়াই চলিয়াছেন। শ্রীভক্তমালে পাওয়া যায়—

"অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিগ্‌বিদিক্‌ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায়॥
জল, জঙ্গল, তৃণ, কণ্টক, শর্করা।
নাহি মানে, ধায় মাত্র বাতুলের পারা॥"

এইভাবে সমস্ত দিন ছুটিয়া একদিনেই ১৫ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করত শ্রীরঘুনাথ সন্ধ্যায় এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহৃদয় গোপ তাঁহাকে উপবাসী দেখিয়া একটু দুধ খাইতে দিলেন। তাহা পান করিয়া তিনি সেই রাত্রিতে সেখানেই পড়িয়া রহিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬পঃ ১৭২-১৭৫) বর্ণিত আছে—

"শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা॥
গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে-বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা॥"

সুখের সংসারে আগুন

এদিকে পরদিন প্রাতঃকালে প্রহরীর দল জাগিয়া দেখে রঘুনাথ ঘরে নাই। তাহারা ছুটিয়া আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—"আমার আজ্ঞা লইয়া সে ত' নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে!" এইবার সকলেই বুঝিল যে, এতদিনে রঘুনাথ নিশ্চয়ই পলাইয়া নীলাচলে যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা গেল না। চারিদিকে কোলাহল উঠিল। চতুর্দ্দিকে লোক পাঠান হইল, কিন্তু তাঁহার খোঁজ কেহই দিতে পারিল না। তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন দাস মনে করিলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেছেন, খুব সম্ভব রঘুনাথও সেই সঙ্গেই আছে। ভক্তগণ যে পথে যাইতেন, তাহা সকলেই জানিতেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীল শিবানন্দ সেন মহাশয়কে একখানি চিঠি দিয়া দশজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। এই শ্রীশিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন. তাঁহার একমাত্র পুত্র রঘুনাথও সেই সঙ্গে আছে মনে করিয়া, অতি বিনয়-সহকারে তাঁহাকে একখানি অনুরোধ পত্র-দিলেন— "আমার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ আমাদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া সম্ভবতঃ আপনাদের সঙ্গে নীলাচলে যাইতেছে। সে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে উন্মাদ, সে চলিয়া গেলে আমার সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে। সুতরাং পত্র পাওয়া মাত্র, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে এই লোকের সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।" সেই দশজন লোক ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গিয়াই বৈষ্ণব-যাত্রিগণকে দেখিতে পাইল। শিবানন্দের হাতে পত্র দিতে, তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে—না, রঘুনাথ ত' তাঁহাদের সঙ্গে আসে নাই। রঘুনাথের সঙ্গে সেই প্রেরিত লোক-দের দেখা হইল না, তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

রঘুনাথের পিতা-মাতা তাহাদের নিকট বিস্তারিত সংবাদ শুনিয়া বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

এদিকে প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথ প্রভুর চরণ-লাভার্থ পুরী যাইবার পথে কত দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিতেছেন! পরদিন প্রাতে সেই বাথান অর্থাৎ গোশালা হইতে উঠিয়া তিনি পূর্ব্বদিক্ ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে চলিলেন। ক্রমে ছত্রভোগ অতিক্রম করিয়া গেলেন, এই ছত্রভোগ বর্ত্তমানে 'জয়নগর-মজিলপুর'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম-দ্বয়ের নিকট অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এখানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এই ছত্রভোগ পার হইয়া রঘুনাথ প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া, সামান্য সামান্য গ্রামের কত বন-জঙ্গল—কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। কুসুম-কোমল চরণ-দু'খানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। সারা-দিন পথ হাঁটার কষ্ট, তাহার উপর আবার অনাহার ও মানসিক উদ্বেগ! কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই! কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না! অহর্নিশ যাঁহার অন্তর শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তাঁহাকে দারুণ পথকষ্ট, অনাহার, অনিদ্রা, চোর-দস্যু, সর্প-ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তুর ভয় প্রভৃতি কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। যত দিন অতিক্রম হইতে লাগিল, ততই রঘুনাথের ভয়ের মাত্রা কমিয়া আশার মাত্রা বাড়িতে লাগিল। এইরূপে একদিন দুইদিন নয়, বারদিন যাবৎ নানারকম ক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে রঘুনাথ তাঁহার চিরাভীপ্সিত নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বার-দিনের মধ্যে তিনি মাত্র তিনদিন কিছু আহার করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬ ১৮৪-১৮৮) বর্ণিত আছে—

"এথা রঘুনাথ-দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ-মুখ হঞা॥

ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত-দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্য–চরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ-পান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ–প্রাণ ॥
বারদিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥"

মধুর-মিলন

এতদিনে শ্রীরঘুনাথের আশা পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহার আরাধ্য-দেবের শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীল মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে রঘুনাথ আসিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত দেখিতে পাইয়া পরমোল্লাসে বলিলেন—"প্রভো! এই যে রঘুনাথ আসিয়াছে।" প্রভু তাঁহাকে পরম প্রীতিভরে নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন—

"হে নাথ! হে প্রভো! ওহে করুণা-নিধান!
কৃপা করি' শ্রীচরণে দাও মোরে স্থান ॥
অনাথ, অধম মুঞি অতি দীন-হীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন ॥" (ভক্তমাল)

প্রভু উঠিয়া ভূমি হইতে রঘুনাথকে তুলিয়া আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভুর কৃপাময় প্রেমালিঙ্গন পাইয়া রঘুনাথের বহুদিনের তাপিত হৃদয় আজ পরম সুশীতল হইল। আহা, ভক্ত ভগবানের কি অপূর্ব্ব মধুর-মিলন! রঘুনাথের তাৎকালিক সেই

অন্তরের ভাব বর্ণনা করিবার ভাষা মাদৃশ অধম, দুরাচার, ভগবদ্-বিমুখ জীব কোথা হইতে পাইবে? শ্রীভগবানের একান্ত অন্তরঙ্গ নিজজন এবং তদনুগৃহীত জনগণই তৎকৃপায় তাহা বর্ণনা করিতে বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬।১৮৯-১৯১)—

"স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ-দত্ত কহে,—'এই আইল রঘুনাথ'॥
প্রভু কহেন,—'আইস, তোঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন'॥"

কত বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া তবে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিলেন। নদীর স্রোতঃ যখন সাগরের সহিত মিলিবার জন্য ধাবিত হয়, তখন কোনপ্রকার বাধাই ইহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। বাধা পাইলে বরং বেগ আরও বাড়িয়া যায়। রঘুনাথেরও তদ্রূপ, যত বাধা পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। বাধা দ্বারাই ভক্তহৃদয়ের বল পরীক্ষা করা যায়। বাধায় বাধায় ভক্তহৃদয় ভক্তিবলে সুদৃঢ় হইতে থাকে। শত বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও যে ভক্তি অবিচলিতা ও অপ্রতিহতা থাকে, তাহাই পরা-ভক্তি। সংসারের কোন প্রতিবন্ধকই প্রকৃত ভক্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। তাই মহাপ্রভু পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে?" আবার রঘুনাথের পিতা শ্রীল গোবর্দ্ধন দাসও তাঁহার স্ত্রীকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"চৈতন্যচন্দ্রের 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?" ভক্তের ঐকান্তিকী ইচ্ছা আর শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা, এই দুই এর মিলনে ভক্ত-ভগবানের মিলন সম্ভব হইয়া থাকে। হায়! আমাদের

অবস্থা চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায়, আমরা কোথায় পড়িয়া আছি ! সামান্য একটু বাধাতেই যেন মনে হয়, আর বুঝি অগ্রসর হইতে পারিব না। দয়াময় ভগবান্ ভক্ত-চরিত্রের মাধ্যমে যে আমাদিগকে কত শিক্ষা দেন, কিন্তু এমনই ভাগ্যহীন আমরা যে, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না।

অতঃপর রঘুনাথ শ্রীপাদ স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ রঘুনাথের গৃহত্যাগকে উপলক্ষ্য করিয়া অনর্থযুক্ত সাধককে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকৃপার মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে,—) কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে !
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬প ১৯৬)

পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা—অধিকতর সামর্থ্য-বিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না ; বিশেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠাগর্ত্ততুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন।" (ঐ অনুভাষ্য)।

দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী মহাবলীয়সী কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীব নিজের চেষ্টায় জড়বিষয়ানুরাগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। কৃষ্ণকৃপা আবার ভক্তকৃপানুগামিনী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস দ্বারা, পরে সহগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীল

রাঘব পণ্ডিতাদি নিজজন মাধ্যমে তৎপ্রতি কৃপা বিস্তার করিলেন। "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫), "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥" (ঐ ম ২২।৪৭)

রঘুনাথের ছিল ঐকান্তিকী গৌরকৃষ্ণ-নিষ্ঠা, তাই তিনি স্বগত-ভাবে মনে মনে কহিলেন—"আমি কৃষ্ণ কেমন তাহা জানি না। আমি এই মাত্রই জানি যে, আপনার কৃপা আমাকে জড়বিষয়-সংস্রব হইতে উদ্ধার করিয়াছে। যথা,—

"রঘুনাথ কহে, মনে—'কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি' ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৪)

মহাপ্রভু এইবারে রঘুনাথের পূর্ব্ব পরিচয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন—"তোমার পিতা ও জ্যেঠা আমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে 'দাদা' সম্বোধন করিতেন। আর তিনিও তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধে 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন। সেই সূত্রে ইঁহারা আমার 'আজা' অর্থাৎ মাতামহ। মাতামহ সম্পর্কে পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা চলে, এজন্য বলিতেছি—তোমার বাপ জ্যেঠা দুইজনই ব্রাহ্মণের সম্মানকারী পালক, পোষ্টা ও সহায় ছিলেন, সেইজন্য প্রাকৃত লৌকিক-বিচারে শ্রেষ্ঠ ও সজ্জন বলিয়া আদৃত হইতেন। কিঞ্চিৎ বৈষ্ণবতাও তাঁহাদের ছিল, তাহাতে সাধারণ জগতে তাঁহারা 'বৈষ্ণব' বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পারমার্থিক শুদ্ধ ভক্তের বিচারে তাঁহারা 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' নহেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াই জানিতেন। উঁহারা পরম বিষয়ী, বিষয়-বিষজ্বালাকেই উঁহারা 'সুখ' বলিয়া মনে করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট বলা চলে। যতই সদ্‌গুণ ও সদাচার থাকুক না কেন, ইঁহারা কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন।

যে পর্য্যন্ত 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' ইত্যাদি শুদ্ধভক্তির লক্ষণোদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও জীব 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকে। বিষয় উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাদুঃখ দেয়, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সংসারিকগণ সেই দুঃখপ্রদ বিষয়কেই 'মহাসুখ' বলিয়া বিচার করে। জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয় 'বিষ্ঠার' ন্যায় পরিত্যাজ্য। বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব ঘৃণ্য পুরীষের কীট-তুল্য অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে জড়বিষয়-ভোক্তাভিমানী প্রাকৃত বিষয়ী বিষ্টাগর্ত্তের কীট-তুল্য এবং সেই কীট-রূপেই তাহারা মহানন্দে নিতান্ত ঘৃণ্য বিষয়-বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত। ইহারা আবার তাহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুষ্ঠান-দ্বারাই অজ্ঞাতসারে বিষয়ে আরও জড়াইয়া পড়ে। 'বিষয়' এই প্রকার ভীষণ বস্তু! যাহাহউক কৃষ্ণ বড়ই কৃপাময়। এইরূপ 'বিষয়' হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার মহিমা বর্ণনাতীত।"

মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধপার্ষদ রঘুনাথের আবার বিষয়-ভোগ কোথায়? তথাপি আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত সাধককে শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু এইরূপ উপদেশ দিলেন—

"(প্রভু কহেন,—) তোমার পিতা-জ্যেঠা, দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি মানে॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ 'দাস'।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস॥
ইহার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা'।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৫-২০০)

শ্রীমৎ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ

রঘুনাথ ভববন্ধ হইতে মুক্তি পাইলেন। তিনি আজ মহাপ্রভুর চরণে শরণাগত। শরণাগতের পালক শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ জনের নিত্য মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ব্রজলীলায় রঘুনাথ ছিলেন—'রতিমঞ্জরী', আর শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী ছিলেন—'ললিতা-সখী'। এক্ষণে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুও মনে করিলেন—রঘুনাথকে তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর স্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবেন। তাই তিনি রঘুনাথের হাত ধরিয়া স্বরূপ গোস্বামীর হাতে সমর্পণ করতঃ বলিলেন—"স্বরূপ, আজ আমি এই রঘুনাথকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। তুমি পুত্রের ন্যায় উহাকে স্নেহ করিও এবং ভৃত্যের ন্যায় উহার সেবা গ্রহণ করিও। আজ হইতে ইহার নাম হইল—'স্বরূপের রঘু'। আমার নিজজনের মধ্যে তিন জন রঘুনাথ। বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্ট রঘুনাথ আর এই হইল—স্বরূপানুগ দাস-রঘুনাথ অর্থাৎ 'স্বরূপের রঘু' নামে ইহার পরিচয় হইল।" (অবশ্য ইনি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী—শ্রীদাস গোস্বামী বা শ্রীদাস রঘুনাথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।) শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীপ্রভুও মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তিনিও কহিলেন—"আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" এই বলিয়া তিনি রঘুনাথকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই লীলা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অ ৬।১) —

"কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্ ।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥"

অর্থাৎ "যিনি কৃপা-গুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গী পূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে আমি প্রপন্ন হই।"

তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬।২০১-২০৫) বর্ণনা করিয়াছেন—

"রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া ।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্র-চিত্ত হঞা ॥
'এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে ।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে' ॥
এত কহি', রঘুনাথের হস্ত ধরিলা ।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥
স্বরূপ কহে,—'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল' ।
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥"

অযাচক-বৃত্তি

পরমদয়াল ভক্তবৎসল মহাপ্রভু রঘুনাথের পথশ্রান্ত ক্লান্ত শ্রীঅঙ্গের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত স্নেহার্দ্র চিত্তে তাঁহার সেবক গোবিন্দ দাসকে বলিলেন—"গোবিন্দ ! পথে আসিতে রঘুনাথ বহু উপবাসাদি

করিয়াছে। পথশ্রমে সে বড় ক্লান্ত, সুতরাং কিছুদিন পর্য্যন্ত তুমি তাহার যত্ন করিও। আহারাদির ব্যবস্থা যাহাতে সময় মত হয়, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি'॥
'পথে ইঁহ করিয়াছে বহু ত' লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ'॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২০৬-২০৭

এইবার মহাপ্রভু রঘুনাথকে সমুদ্রস্নানান্তে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করতঃ প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনিও মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিবার জন্য উঠিলেন। রঘুনাথ এইবারে অন্যান্য ভক্তগণ-সহ মিলিত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্বস্নেহ ও কৃপা-দর্শনে ভক্তবৃন্দ বিস্মিতচিত্তে সকলেই তাঁহার সৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক এদিকে রঘুনাথ মহাপ্রভুর আদেশানুসারে সমুদ্রস্নানান্তে, পরমভক্তিভরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পুনরায় প্রভুসেবক গোবিন্দের নিকট আসিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে প্রভুর অবশিষ্ট-পাত্র দিলেন এবং রঘুনাথও মহানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। এইভাবে রঘুনাথ পঞ্চদিবস শ্রীল দামোদর-স্বরূপের নিকট থাকিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ষষ্ঠ দিবস হইতে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—"বৈরাগীর পক্ষে ত' এইরূপ বিলাস—বসিয়া বসিয়া স্থূলভিক্ষা গ্রহণ শোভা পায় না। আমার উদরের তৃপ্তির জন্য আমি মহাপ্রভুর সেবক পরম ভক্ত গোবিন্দকে উদ্বেগ দিব, ইহা ত' আমার পক্ষে কোনমতেই উচিত হইতেছে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রঘুনাথ অতি বিনয়ের সহিত গোবিন্দকে তাঁহার জন্য প্রসাদ আনিতে নিষেধ করতঃ পরম

নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তগণের নিয়মানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের উদরের তৃপ্তির জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করেন না, সারাদিন ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন এবং স্বচ্ছন্দে শ্রীমূর্ত্তি দর্শনাদি করেন; রাত্রি দশ দণ্ডের পর শ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করেন। পূর্ব্বাপর এইরূপ নিয়ম আছে—শ্রীজগন্নাথ-দেবের গৃহস্থ সেবকগণ যখন রাত্রিতে গৃহে ফিরেন, তখন সিংহদ্বারে কোন নিষ্কিঞ্চন অযাচক বৈষ্ণব প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন কি-না, তাহা দেখিয়া পসারীর নিকট অবশিষ্ট প্রসাদান্ন রাখিয়া যান। কোন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত না হন, এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। শ্রীক্ষেত্রে সর্ব্বকালেই এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ভক্ত আবার ছত্রেও মাগিয়া খান। রঘুনাথও সারাদিন ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন, সন্ধ্যার পরে পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া রাত্রি দশ দণ্ডের পর সিংহদ্বারে অযাচকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে যে প্রসাদ দান করিতেন, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপে রঘুনাথ বৈরাগ্য-প্রধান নিষ্কিঞ্চনগণের আদর্শ-স্থানীয় হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬।২১৪-২১৯) বর্ণিত আছে—

"আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ'।
সেবা সারি' রাত্র্যে কহে গৃহেতে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার॥

সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥
কেহ ছত্রে মাগি' খায়, যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয় ॥"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-ভজনে মগ্ন থাকেন। কৃষ্ণ-প্রীতির জন্যই তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছামূলক যাবতীয় সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছামূলে কৃষ্ণ-সেবার জন্যই কৃষ্ণেতর বিষয়-মাত্রে উদাসীন থাকেন। ইহা সাধারণ লোকের বোধগম্য ব্যাপার নহে। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবাঞ্ছাশূন্য ফল্গুবৈরাগ্যের কোন আদর করেন না, কিন্তু কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত যুক্তবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির শুদ্ধ-ভজন-চতুরতা দেখিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬পঃ ২২০) লিখিত আছে—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥"

এদিকে শ্রীগোবিন্দ শ্রীরঘুনাথের তদ্দত্ত প্রসাদ না লইয়া রাত্রিতে সিংহদ্বারে খাড়া হইয়া প্রসাদার্থী হইবার সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু খুবই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"হাঁ, রঘুনাথ ভালই করিয়াছে, ত্যক্তগৃহ বৈরাগীর আচরণ ত' এই-রূপই হওয়া কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত বৈরাগীর আচরণ বা ধর্ম্ম বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—ইহাদ্বারা খুব সংক্ষিপ্ত পরিমিত অথচ সারগর্ভবাক্যে বৈরাগীর বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ২২৩-২২৭)—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয়, রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৩-২২৭)

মহাপ্রভুর এই সুধাময় উপদেশ শুদ্ধভজন-প্রয়াসীমাত্রেরই বিশেষভাবে সর্ব্বক্ষণ স্মরণপথে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এক শ্রেণীর 'বৈরাগী'-ব্রুব আছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে সনাতনধর্ম্মের দোহাই দিয়া নানা-প্রকার সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালান' মহাপাপকর্ম্ম—অত্যন্ত নারকীর বিচার! এই শ্রেণীর জগন্নাশিকা ধর্ম্মধ্বজিতা ধার্ম্মিকসমাজ ত' দূরের কথা মনুষ্যসমাজ হইতেই অবিলম্বে উচ্ছেদনীয়া। নতুবা সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ রঘুনাথের জীবন বিশুদ্ধ বৈরাগ্যধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ, নিষ্কপট ভজনপ্রয়াসীমাত্রেরই এই আদর্শ সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

উপদেশ ও শিক্ষা

শ্রীল রঘুনাথ এইভাবে অযাচক-বৃত্তিতে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ভজনের পিপাসা তাঁহার ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিরন্তর তিনি ভজনানন্দেই বিভোর হইয়া থাকিতেন।

তথাপি তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার কিভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা যেন এখনও ঠিক হইতেছে না। তাঁহার ইচ্ছা, এই সম্বন্ধে স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে কিছু উপদেশ শ্রবণ করেন। কিন্তু দীনচিত্ত—অতি বিনয়ী রঘুনাথ নিজে মহাপ্রভুর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রভুর নিকট কোন কথা বলিতে হইলে, তিনি শ্রীগোবিন্দ দাস অথবা তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল স্বরূপদামোদর দ্বারা তাহা প্রভুর চরণে নিবেদন করাইতেন। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬প ২৩০)—

"প্রভুর আগে কথা-মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥"

তাই একদিন তিনি মহাপ্রভুকে জানাইবার জন্য স্বীয় গুরু শ্রীল স্বরূপের শ্রীচরণে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিলেন,— "প্রভু কি উদ্দেশে ঘর ছাড়াইয়া আমাকে এখানে আনিলেন, আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা যদি স্বয়ং শ্রীমুখে আমাকে কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই কৃতার্থ হই।"

"কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥" (ঐ ২২৯)

তখন দয়াময় শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

"প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥
'কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ' ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬ পঃ ২৩১-২৩২)

মহাপ্রভু একটু হাসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, আমি ত' তোমাকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহাকেই তোমার

উপদেষ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমার আর চিন্তা কি? তাঁহাকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' শিক্ষা কর। গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপই সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের মূল আচার্য্য। আমিও যাহা জানি না, তাহা তিনি জানেন। তথাপি আমার স্বমুখনিঃসৃত আদেশ-বাণীতে যদি তোমার একান্তই বিশেষ শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার এই উপদেশগুলি পালন করিও" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৬৩-২৩৫ —

"হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
'তোমার উপদেষ্টা করি,' স্বরূপেরে দিল'।।
'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ' ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে।।
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়।।"

এই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া রাগানুগভজনকারিগণের অবশ্যপাল্য আচার বর্ণনা করিতেছেন—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ।।"

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৮

গ্রাম্যকথা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত কোনকথা কখনই কোন সাধকের বলাও উচিত নহে, শোনাও উচিত নহে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা ইহাও বৈরাগ্যবিঘাতক, ইহাতে ইন্দ্রিয়গণের বিলাস-ব্যসন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ভজন-স্পৃহাকে একেবারে সুপ্ত করিয়া দিবে।

ইতঃপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—জিহ্বার লালসা জীবকে শিশ্নোদরপরায়ণ করিয়া তুলিয়া কৃষ্ণধনলাভে চিরবঞ্চিত করে। অন্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দান করিবে ও স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবে। আর মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিবে—ইহাই বৈরাগীর কৃত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকেও উপদেশ দিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সংক্ষেপে তিনি রঘুনাথকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ইহার সবিশেষ-তত্ত্ব স্বরূপের নিকট জানিয়া লইতে বলিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর উপদেশ-বাক্য শুনিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ শ্রীদামোদর স্বরূপের নিকট সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ তদনুযায়ী শ্রীদামোদর-স্বরূপানুগত্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের 'অন্তরঙ্গ'-সেবা করিতে লাগিলেন। "মনে মনে স্বীয় স্বরূপ-দেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গ'-সেবা। স্বরূপ-গোস্বামী—ব্রজে 'শ্রীললিতা দেবী'। তাঁহার গণ-মধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ সেবা করিতেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)। অন্তরঙ্গ সেবায় বিমল প্রেমানন্দ-রসের সঞ্চার হয়। রঘুনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আনন্দ-চিন্ময়রসে পুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

পিতৃস্নেহ ও পুত্রের বৈরাগ্য

এদিকে রথযাত্রার সময় উপস্থিত। প্রতি বৎসরের মত এইবারও গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীতে পৌঁছিলেন। মহাপ্রভু সকল-ভক্ত লইয়া গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন করিলেন এবং টোটা গোপীনাথের মন্দিরে যাইয়া বন-ভোজন উৎসব সম্পন্ন

করিলেন। পুনঃ রথাগ্রে সগণ প্রভু নৃত্য করিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর এইসব ভক্ত্যঙ্গ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনি সকল-ভক্তের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রকাশ করিলেন। শিবানন্দ সেন মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন— "তুমি বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিলে পর, তোমার পিতা তোমাকে বাড়ী ফিরাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট পত্র লেখেন। দশজন লোক ঐ পত্রসহ ঝাঁক্‌ড়া পর্য্যন্ত আসিয়া আমার দেখা পায়। কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে না পাইয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যায়।" ইত্যাদি পূর্ব্ব বিবরণ ব্যক্ত করিয়া তিনিও রঘুনাথকে গৌরকৃপা লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌড়ের ভক্তগণ চারিমাস-কাল পুরীতে থাকিয়া পুনঃ গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ দাসের পিতা শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট লোক পাঠাইয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই লোকটি শ্রীশিবানন্দের নিকট আসিয়া বলিলেন—"পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস নামে কোন যুবক বৈষ্ণবকে কি আপনারা দেখিয়াছেন? তাঁহার সহিত আপনার কি পরিচয় হইয়াছে?" শ্রীশিবানন্দ, রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণব-জগতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায়, তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তিনি মহাপ্রভুর নিকটেই আছেন, পরমবিখ্যাত তিনি, তাঁহাকে কে না জানে? যদিও তিনি অল্পদিন হইল নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজনের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীল স্বরূপ দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি এখন মহাপ্রভুর ভক্তমাত্রেরই প্রাণস্বরূপ। দিন-রাত্রি সর্ব্বদাই তিনি কীর্ত্তনানন্দে বিভোর থাকেন। ক্ষণমাত্র-কালও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ছাড়া

স্বতন্ত্র থাকেন না। কঠোর বৈরাগ্য তাঁহার, আহার, পরিধান কিছুর উপরই আর লক্ষ্য নাই। কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া দশ দণ্ড রাত্রির পর সিংহদ্বারে প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করেন। কেহ দয়া করিয়া কিছু দিলে আহার করেন, নতুবা উপবাস করিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দেন।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"শিবানন্দ কহে,—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে॥
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম॥
রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে, প্রভুর চরণ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ॥"

(অন্ত্য ৬পঃ ২৫১-২৫৬)

রঘুনাথের এইরূপ কঠোর বৈরাগ্য-যুক্ত ভজনের সংবাদ শুনিয়া, সেই ব্যক্তি গোবর্দ্ধন দাসের নিকট গিয়া, তৎসমীপে রঘুনাথ-সম্বন্ধীয় সকল-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিলেন। রঘুনাথ কৃষ্ণ-ভজনের জন্য সকল-ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখন মহাপ্রভুর নিজজন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রাকৃতজগতের পিতামাতার বিচার ধারা ত' আর সেইপ্রকার হয় না, তাঁহারা কৃষ্ণ-ভোগ্য ভক্তকে নিজ-ভোগ্য পুত্র-বুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাই সপত্নীক

গোবর্দ্ধন দাস অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কিছু অর্থ পাঠাইতে পারিলেই তাঁহাদের পুত্রের কষ্ট কিছুটা লাঘব হইবে। সুতরাং রঘুনাথের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য চারিশত মুদ্রা, দুইজন ভৃত্য ও একজন পাচক-ব্রাহ্মণকে শিবানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শিবানন্দ সেন তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন,—"তোমরা আমাকে ছাড়া পুরীধামে যাইতে পারিবে না। সুতরাং এখন ঘরে ফিরিয়া যাও। আমি যখন তথায় যাত্রা করিব, তোমাদিগকে সংবাদ দিব, তখন তোমরা আমার নিকট আসিবে, আমি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইব।" যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥
শুনি' তাঁর মাতা-পিতা দুঃখিত হইল।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈল॥
চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ।
শিবানন্দ কহে,—'তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা॥
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিমু।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু॥"

(অন্ত্য ৬পঃ ২৫৭-২৬১)

শিবানন্দ সেন শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস প্রেরিত মনুষ্যটির নিকট শ্রীল রঘুনাথের গুণাবলী যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীল কবিকর্ণপূরও ঐ প্রসঙ্গটি তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে' বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥"
— (চৈঃ চঃ অ ৬।২৬৩)

অর্থাৎ (কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীবাসুদেব-দত্তের প্রিয়-পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দন আচার্য্য। তাঁহার শিষ্যই রঘুনাথ দাস। তাঁহার গুণে তিনি, আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়-দ্বারা সতত স্নিগ্ধ, স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

তাঁহার কি-প্রকার অতুল সৌভাগ্য, তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অ ৬।২৬৪)—

"যঃ সর্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ॥"

অর্থাৎ রঘুনাথ সকলেরই অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি স্বতঃপ্রকটিত সৌভাগ্য-ভূমি-স্বরূপ, কারণ হলকর্ষণ (হালচাষ) ব্যতীতই তাঁহাতে শ্রীচৈতন্য-প্রেমবীজ পড়িবামাত্র উহা অতুলনীয় প্রেম-মহীরুহে পরিণত হইয়া অত্যন্ত সুফল ফলিয়াছে।

"শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিলা॥" (ঐ ২৬৫)

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে বর্ষাকাল আসিলে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতিবৎসরের ন্যায় নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পূর্ব্ব কথানুযায়ী রঘুনাথের জন্য তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত সেবক, ব্রাহ্মণ, চারি-শত মুদ্রা ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া শ্রীশিবানন্দ শ্রীপুরুষোত্তমধামে রওনা হইয়া গেলেন। যথাস্থানে পৌঁছিয়া তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনদাসের

অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরঘুনাথের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও মুদ্রা ইত্যাদি তাঁহার জন্য আনা হইয়াছে। কিন্তু মহাবিরক্ত রঘুনাথ নিজ ভোগার্থ সেইসকল দ্রব্যের কিছুই স্বীকার করিলেন না। তাহাতে, মাত্র একজন ভৃত্য ও একজন ব্রাহ্মণ কিছু অর্থ লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রঘুনাথ স্থির করিলেন,— এই অর্থ হইতে তিনি আট পণ কৌড়ি মাত্র লইয়া তদ্দ্বারা মাসে দুই-দিন মহাপ্রভুকে ভোগদিবার ব্যবস্থা করিবেন। (অষ্টপণ কড়ি অর্থাৎ ৬৪০ কড়া কড়ি— তৎকালীন ।।০ আট আনা)।

"তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ।।
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৬৯-২৭০)

দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ ভোগ দিয়া অবশেষে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই মাস পরে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি একদিন শ্রীপাদ স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘু আমাকে আর নিমন্ত্রণ করে না কেন ?" তাহাতে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী উত্তর দিলেন,— "প্রভো ! রঘুনাথ আপন মনে বিচার করিয়া দেখিল, বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া নিমন্ত্রণ করায় প্রভুর মন হয়ত' প্রসন্ন হইতেছে না, কারণ তাহার নিজের মনই ইহাতে তৃপ্ত হয় না। আর প্রভু যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, সে কেবল তাহার উপরোধে পড়িয়া। তাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্য ফল হয় না। বস্তুতঃ 'অহং-মম'-অভিমানযুক্ত জড়-ভোক্তা প্রাকৃত-বিষয়ীর ভোগ্য অর্থ জড়াতীত সচ্চিদানন্দ-বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিপদ হয় না, তদ্দ্বারা সেবা করিতে চেষ্টা করিলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা প্রতিষ্ঠামাত্রই ফল লাভ হয়। উহাতে বাস্তবিক অপ্রাকৃত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ

সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক নিত্য মঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজ অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ দ্বারা এবং কায়মনোবাক্যে-প্রাণে অপ্রাকৃত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

প্রতিষ্ঠা ভক্তিপথের অত্যন্ত প্রতিকূল, কণ্টকস্বরূপ। শুদ্ধভক্তের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠাকে সকলেই ঘৃণা করেন। প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি ভক্তিপথে আদৌ অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রতুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥"

অর্থাৎ হে মন! প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, অতএব বিশুদ্ধ সাধুপ্রেম কিরূপে এই হৃদয় স্পর্শ করিবে? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ অতুলনীয় সামন্ত-রাজের সেবা কর, যাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীকে আমার হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া সাধুপ্রেমকে তথায় প্রবিষ্ট করান।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥

শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥"

এই প্রকার প্রত্যেক সদাচার্য্য ভক্তিপথের অত্যন্ত বাধাস্বরূপিণী 'প্রতিষ্ঠা' হইতে সাবধান হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নানাভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ করা সম্বন্ধে আরও একটি কারণ বলিলেন,—"রঘুনাথের মনে সন্দেহ হইতেছে যে, তাহার ন্যায় মূর্খ বালিশ ব্যক্তির নিমন্ত্রণ না মানিলে তাহার মনে হয়ত' দুঃখ হইতে পারে, এই বিচারে কেবল তাহার মন রক্ষার জন্যই তাহার উপরোধে পড়িয়া প্রভু এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এই অসঙ্গত কার্য্য ত্যাগ করাই তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ বিচার করিয়াই সে নিমন্ত্রণ করা ছাড়িয়া দিয়াছে।" এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল ॥

উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥"
(অঃ ৬।২৭৪-২৭৬)

শ্রীপাদ স্বরূপের মুখে রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিয়া বলিতে লাগিলেন— "হাঁ, রঘু ঠিক বুঝিয়াছে। বিষয়ীর অন্ন খাইলে মন মলিন হইয়া যায়। মলিন মনে কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক হয় না। বিষয়ীর অন্ন রাজস অন্ন। উহাতে দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই মন মলিন হইয়া যায়। কেবল তাহার উপরোধেই আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। সে যে নিজে বুঝিয়াই ইহা ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা অতি উত্তম।" রঘুনাথের হৃদয়ে শাস্ত্রের এই সকল সূক্ষ্ম-বিচার স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিপথের পথিকগণের কিরূপ সঙ্গ ও সদাচার বরণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন, যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬পঃ ২৭৮-২৭৯)—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥"

গৃহব্রত বা গ্রাম্য-ব্যবহারবিৎ জড়বিষয়াসক্ত ব্যক্তিই বিষয়ী, তাহার সঙ্গই 'রাজস'-সঙ্গ'। 'বিষয়ীর' বিষয়বিদূষিত-চিত্তস্পৃষ্ট অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গ-ফলে সাধকগণের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তাহার ফলে সাধক সঙ্গানুরূপ স্বভাব লাভ করেন। 'অবৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণব'-নামধারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্ন-প্রীতির সহিতও যদি কেহ কোন সঙ্গ করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-কৃষ্ণ-ভক্তির স্থানে 'জড়েন্দ্রিয়'-তর্পণ-মূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া সেই

সাধককে কৃষ্ণভক্তি-চ্যুত করিয়া দেয়। সুতরাং তাহাকে এই প্রকার সঙ্গ হইতে খুব সাবধান হওয়া উচিত।

এদিকে আবার রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টাও ছাড়িয়া দিলেন। ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। গোবিন্দের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া, প্রভু শ্রীপাদ স্বরূপকে আবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে।
'রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাঢ় কেনে নহে সিংহদ্বারে' ?"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮২)

শ্রীপাদ স্বরূপ উত্তর দিলেন,—"সিংহদ্বারে অন্নের জন্য দাঁড়াইয়া লোকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা, রঘুনাথ ভালবোধ করে না। ত্যক্ত-গৃহ বিরক্তগণের আচার-আদর্শ মাধুকরী ভিক্ষা স্বীকার করা, তাই সে মধ্যাহ্ন সময়ে ছত্রে যাইয়া কিছু মাগিয়া আনে এবং তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছে।"

মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। পরের ইচ্ছামত তাহার নিকট অন্ন লাভ করার জন্য অপেক্ষা করা, ইহা নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিকূল। তাই তিনি বলিলেন,—

"(প্রভু কহে,—) ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥
ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪, ২৮৬)

'ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; ইনি দিয়াছেন; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন; এই যে-ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না। অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন';—অযাচক বৈরাগি-বেষি-গণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়)

এরূপ আশা করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। মাধুকরী ভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তগণের হরিভজনের অনুকূল। মন স্থির না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। দেহধর্ম্মে আহারের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যদি ঐ চিন্তাতেই মন মগ্ন থাকে, তবে আর কৃষ্ণভজনের সময় কি করিয়া হয়? সুতরাং সাধকদের পক্ষে ইহা একটি প্রবল বাধা-স্বরূপ। রঘুনাথ সহসা এই বাধার বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কৃষ্ণধ্যান ও কৃষ্ণগুণ-গানে দিন রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যান ব্যতীত অন্যভাব স্থান পাইত না।

শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা

মহাপ্রভু রঘুনাথের এইরূপ কঠোর বৈরাগ্যাচরণ ও বিশুদ্ধ ভক্তিভাব দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি পুরস্কার-স্বরূপ অমূল্যধন রঘুনাথকে দান করিলেন। ভক্তিরাজ্যে তাঁহার ন্যায় ধন আর কিছুই হইতে পারে না। এই অমূল্যধনের নাম—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা। তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে এই দুই অপূর্ব্ববস্তু আনিয়া মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু এই অপূর্ব্বধন কখনও মাথায় ধারণ করিতেন, কখনও নাসায় ঘ্রাণ লইতেন, কখনও বা বক্ষে বা নেত্রে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুতে সিক্ত করিতেন। তিন বৎসর ব্যাপিয়া তিনি এই মহাধন পাইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাকে প্রভু চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকলেবর বলিয়া মনে করিতেন। এইবার সন্তুষ্ট হইয়া তিনি এই মহাধন রঘুনাথকে দান করিলেন। যথা,—

"এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা॥

শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব-বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলারে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥
এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিলা।
তুষ্ট হৈঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৭-২৯৩)

যেমন করুণাময় ভক্তবৎসল প্রভু, তেমনই তদীয় ভক্তও তাঁহার কৃপালাভের সুযোগ্য-পাত্র, আবার কৃপার পরিচায়ক পুরস্কারও তেমন অতীব অপূর্ব্ব! প্রভু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ প্রাণাধিক প্রিয়পার্ষদ ভক্ত রঘুনাথ দ্বারা কি-ভাবে ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, কিরূপেই বা ক্রমে ক্রমে—স্তরে স্তরে বৈরাগ্যের চরম সীমায় আরোহণ করা যায়, কৃষ্ণানুরক্তিরূপ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যই বা কি-প্রকার, এই সকল বিষয় ভক্তিযোগারুরুক্ষু সাধক জীব-জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। এক্ষণে ভাগ্যবান্ রঘুনাথ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কি প্রকারে তাঁহার সেই পরম-সম্পদ্ গিরিধারীজিউর যত্ন ও সেবা করিতে হইবে, তাহাও মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"এই শিলা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিগ্রহ-স্বরূপ; রঘুনাথ, তুমি সযত্নে ইঁহার সেবা করিবে। ইঁহার সেবার উপচারাদি সংগ্রহ জন্য তোমাকে কোনপ্রকার

উদ্বেগ পাইতে হইবে না। 'সাত্ত্বিক-পূজা' করিলেই তুমি শীঘ্র কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ করিবে।" যথা,—

"(প্রভু কহে,—) এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি 'সাত্ত্বিক-পূজন'।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬প ২৯৪-২৯৫)

সাত্ত্বিক-পূজার প্রণালীও শিখাইয়া দিলেন—

"এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি'॥
দুইদিকে দুইপত্র মধ্যে কোমল-মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥" (ঐ ২৯৬,২৯৭)

মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-প্রদত্ত মহাধন ও তাঁহার সেবার আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আনন্দ-সহকারে সেবা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি কপর্দ্দক-বিহীন অকিঞ্চন বৈষ্ণব, সুতরাং শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে পূজার পাত্রাদিস্বরূপ জল আনিবার জন্য একটি কুঁজা, গিরিধারীকে বসাইবার জন্য একখানি কাষ্ঠাসন বা পিঁড়া বা পিঁড়ি এবং এক বিতস্তি (অর্দ্ধহস্ত) পরিমাণ দুইখণ্ড বস্ত্র দিলেন। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৮-২৯৯)—

"শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি॥"

মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ মতই রঘুনাথ পূজাদি করেন। নিজ নিত্য-সিদ্ধ লীলাপরিকর—পার্ষদপ্রবরের উপরেই ত' মহাপ্রভু তদভিন্নকলেবর শ্রীগিরিরাজের সেবাভার অর্পণ করিয়াছেন! পূজার সময় মহাভাগবত

শ্রীল রঘুনাথ দাস তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান—এই শিলাই ত' তাঁহার পরমারাধ্য সেই স্বয়ং ভগবান্—সাক্ষাৎ 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন'।

"এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥"

—চৈঃ চঃ অ ৬।৩০০

আহা! ইহার নামই ত' পূজা! ইহাই ত' পূজার প্রকৃত আদর্শ! আমরা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাহা পাথরের, কাঠের বা ধাতুর তৈয়ারী বলিয়া নানা রকম প্রশ্ন করি, ফলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধিজন্য নানাবিধ নিরয়প্রাপক অপরাধ হইয়া পড়ে। আমরা 'পদ্মপুরাণে' দেখিতে পাই,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মানুষবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলমষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত যে-ব্যক্তি সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

এখানেও মহাপ্রভু তাঁহার নিজজনের মাধ্যমে আমাদিগের ভ্রান্তি দূর করিয়া শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা সাধারণ শিলাখণ্ড নহেন, উহা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রাকৃতনেত্রে তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ দর্শন হয় না। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

আহা! আমার প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত শিলা ও গুঞ্জামালা— অহর্নিশ এই চিন্তা করিয়াই রঘুনাথ প্রেমার্ণবে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। সামান্য জল-তুলসী দ্বারা সেবা করিয়া তিনে যে সুখ পাইতেছেন,

ষোড়শোপচার-পূজায়ও তাহা পাওয়া যায় না। যাইবে কি করিয়া? এ যে প্রেমসেবা!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬প ৩০১-৩০২) আমরা পাই—

"প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা॥
জল-তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥"

গৌর-আনা-ঠাকুর—মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও একদিন এইরূপ জলতুলসীর প্রেমসেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমসেবায় আকৃষ্ট হইয়াই ভক্তেচ্ছা-পূরণার্থ ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব সেবাদর্শটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে-ভাবে সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থানে উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৯৬-১১০)—

"প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ॥
লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি' ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥

[বিষ্ণুদ্বারাই বিষ্ণুর অবতারণ, এজন্যই তাঁহার 'অদ্বৈত' আখ্যা]

কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥
'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥'

[অর্থাৎ তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।]

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন' ॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন ॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥"

শ্রীরঘুনাথ, কিছুদিন এইভাবে জলতুলসী-সেবা করিবার পর, শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার স্নেহপাত্র রঘুনাথের প্রভু-সেবার একটি নূতন বিধান উদ্ভাবন করিয়া দিলেন। প্রতিদিন আট কৌড়ির খাজা-

সন্দেশ দ্বারা শ্রীগিরিধারীর সেবা করিবার পরামর্শ দিলেন। "অষ্ট-কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ। শ্রদ্ধা করি' দিলে, সেই অমৃতের সম ॥" কিন্তু রঘুনাথ কপর্দ্দক-বিহীন। প্রতিদিন আট কৌড়ি কোথায় পাইবেন? তাই কৃপাময় শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী শ্রীল গোবিন্দদাসের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করাইয়া দিলেন।

শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালার সেবা পাইয়া তাঁহার এই অহৈতুকী কৃপার অন্তর্গত অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য অনুধাবন পূর্ব্বক তাঁহারই কৃপায় স্থির করিলেন—

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে' ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৬।৩০৭

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু মালা ও শিলা প্রদান-দ্বারা তাঁহাকে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীজিউর রাগময়ী অন্তরঙ্গা-সেবাধিকারই প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর গুঞ্জামালা বা কুঁচফলের মালাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীরূপা দর্শন করিতেন, তাই তাহা দিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় রঘুনাথকে শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা দিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, তাঁহার নীলাচল-লীলার অবসানে তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রীরঘুনাথকে) অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয়া রাগময়ীসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মহাপ্রভুর বড় আদরের 'স্বরূপের রঘু', স্বরূপ-দামোদরেরও অত্যধিক স্নেহপাত্র রঘুনাথ, তাঁহাদেরই কৃপায় তাঁহার অতিগোপ্য ভজন-রহস্যের সন্ধান পাইলেন।

রঘুনাথ প্রেমে আত্মহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। কায়মনে শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-সেবা করিতেন। তাঁহার অনন্তগুণের কথা

বর্ণনা করা আমার মত অধমের পক্ষে সম্ভব নয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে তাঁহার অদ্ভুত অচঞ্চল বৈরাগ্যযুক্ত ভজনের আদর্শ যেন পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬।৩০৯)—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ।।"

কঠোর-বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠা

শ্রীপাদ স্বরূপের চরণান্তিকে অবস্থান করিয়া রঘুনাথ একদিকে যেমন কঠোর-বৈরাগ্য-ব্রত আচরণ করিতেন, অপর দিকে আবার সেইরূপ ভজন-নিষ্ঠারও চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। দিবা রাত্রি ৮ প্রহরের মধ্যে প্রায় ৭।। প্রহরই কাটাইতেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-চিন্তায়। আহার ও নিদ্রায় মাত্র ৪ দণ্ড সময় অতিবাহিত করিতেন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২২।। ঘণ্টাই কাটাইতেন কীর্ত্তন ও স্মরণে এবং আহার ও নিদ্রায় মাত্র ১।। ঘণ্টা সময় লাগাইতেন। কোনদিন বা ভজনাভিনিবেশে আহার নিদ্রাও বন্ধ থাকিত, ২৪ ঘণ্টাই ভজনে অতিবাহিত হইত। কোনদিন এক-আধঘণ্টা নিদ্রা গেলেও সে-নিদ্রা আমাদের মত তমোগুণের নিদ্রা নহে, তৎকালে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন করিতেন। আজন্ম তিনি জিহ্বার লালসা জয় করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, দেহ রক্ষার জন্য যে-টুকু আহারের প্রয়োজন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। ছেঁড়া একখানি 'কানি' অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড বা নেক্‌ড়া ও কাঁথা ব্যতীত অন্য কোন ভাল বস্ত্র তিনি ব্যবহার বা পরিধান করিতেন না। এইভাবে দিন যাপন করিয়া বিজিত-ষড়্‌বর্গ গোস্বামী রঘুনাথ মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিশেষ যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। যাঁহার দিব্য সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ

হইয়াছে, তাঁহার কি আর দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে পারে? জ্ঞানদ্বারা ধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তখন সেই ব্যক্তি কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহ-পুষ্টির জন্য যত্ন করিবেন? লব্ধস্বরূপানুভব শ্রীরঘুনাথও তাই বাহ্য আহারাদি সম্বন্ধে আরও কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন।

পুরীতে পসারীরা মহাপ্রসাদ বিক্রয় করে। দুই-তিনদিনের প্রসাদ যাহা বিক্রয় হইত না তাহা পচিয়া যাইত। এই পচা প্রসাদ বিক্রয়ের অনুপযুক্ত হইয়া গেলে তাহা তৈলঙ্গী গাভীদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু-তাহারাও সেই পর্য্যুসিত প্রসাদ খাইতে পারিত না, পচা গন্ধে ফেলিয়া রাখিত। পরন্তু বৈরাগ্য-চূড়ামণি রঘুনাথ সেই পশুপক্ষীরও পরিত্যক্ত—সকলের সকল দাবীদাওয়া-শূন্য অন্ন রাত্রে ঘরে আনিয়া জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতেন। ধুইবার পরে ভিতরে ভাতের যে মাজ থাকিত, তাহাই লবণ দিয়া পরম অমৃত তুল্য চিন্ময় মহাপ্রসাদ বিচারে আহার করিতেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬পঃ ৩১৫-৩১৮)—

"প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই-তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি'।
ভাত পাখালিয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি॥
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥"

শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীপ্রভু একদিন রঘুনাথকে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"রঘুনাথ, তুমি প্রতিদিন

একাকী এই অমৃত খাইতেছ! আমাদিগকে কি ইহার কিঞ্চিৎও দিতে নাই? এ তোমার কি প্রকৃতি? আমাকে একটু দাও।" এই বলিয়া শ্রীস্বরূপ পরম আনন্দে তাঁহার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিন্ময় প্রসাদ কিছু চাহিয়া লইয়া সেবন করিলেন এবং পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। গৌরকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত প্রসাদই চিন্ময় কৃষ্ণভুক্তামৃত। ক্রমে গোবিন্দের নিকট মহাপ্রভু এই অমৃত প্রসাদের কথা শুনিয়া, তিনি স্বয়ংই সেই প্রসাদ গ্রহণেচ্ছু হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—"শুনিতে পাইলাম, তোমরা নাকি অতি অপূর্ব্ব প্রসাদ গ্রহণ কর, তবে আমি কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইব?" এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথের নিকট হইতে একগ্রাস কাড়িয়া লইয়া গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ এই ব্যাপারে একটু ভীত ও অপ্রতিভ হইলেন। মহাপ্রভু যেই আর এক গ্রাস তুলিয়া হাতে লইলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী অমনি তাঁহার শ্রীহস্তখানি ধরিয়া বলিলেন,—"প্রভো! ইহা আপনার যোগ্য নহে।" বলপূর্ব্বক গ্রাসটি কাড়িয়া লইলেন। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—"স্বরূপ, প্রতিদিন কতরকম প্রসাদ সেবন করি, কিন্তু বলিতে কি এমন স্বাদ ত' কোনও প্রসাদে পাই না!" এইভাবে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় রঘুনাথের গৃহীত প্রসাদের প্রচুর প্রশংসা করিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬।৩১৯-৩২৪) —

"একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা॥
স্বরূপ কহে,—'ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ'—কি তোমার প্রকৃতি?'
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা॥
'খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?'
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে॥

আর গ্রাস লৈতে, স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তব যোগ্য নহে' বলি' বলে কাড়ি' নিলা॥
প্রভু বলে,—'নিতি-নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথ এইভাবে, মহাপ্রভুর সাধকভক্তের অনর্থ-নিবৃত্তি-নিমিত্ত পালনীয় উপদেশসমূহ যথা,—"ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।" আবার "জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ—কৃষ্ণ নাহি পায়॥" ইত্যাদি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতঃ সাধকের সাধনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভু সাক্ষাৎ তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। আহারের সহিত মনের নিগূঢ়সম্বন্ধ আছে এবং সেইজন্যই রঘুনাথ রসনা জয় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবার আদর্শ এইরূপ শিক্ষা দিলেন। ভজনের উন্নতির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন অর্থাৎ দীনতা, নিরভিমানতা ও ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি, রঘুনাথের সাধকোচিত আদর্শে তৎসমুদয়-গুণই পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। রঘুনাথ একান্তভাবে চেষ্টা করিয়া এই সবই তাঁহার নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছিলেন। সাধন-ভজনের ক্রমোন্নতি কি-প্রকারে করা যায়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই যেন রঘুনাথের আবির্ভাব। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস। তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাময় বৈরাগ্য দর্শনে মহাপ্রভু অত্যধিক সন্তোষ লাভ করিলেন। এইভাবে ভক্ত-ভগবানের মধুর-লীলার মাধ্যমে সাধনপথের পথিকদের সাধন শিক্ষা দিয়া রঘুনাথ ১৬ বৎসর শ্রীপুরীধামে আনন্দে অতিবাহিত করিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস তাঁহার রচিত 'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' মহাপ্রভুর করুণা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার কৃপাতেই তিনি শ্রীল স্বরূপদামোদরের আনুগত্য এবং

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা লাভ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ স্তবের নিম্নলিখিত একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ৬।৩২৭)—

"মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥"

অর্থাৎ "আমি মহা-কুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া বিষয়রূপ দাবাগ্নি হইতে উদ্ধার করতঃ তন্নিজজন শ্রীদামোদর-স্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের অতিপ্রিয় গুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।"

মহাবিরহ ও শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা

নীলাচলে শ্রীগৌরশশীর পাদপদ্মে এবং শ্রীপাদ স্বরূপের আশ্রয়ে রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্য ও ঐকান্তিক ভজননিষ্ঠায় নিরত থাকিয়া ১৬ বৎসর আনন্দসাগরে ভাসিয়া চলিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার এই সুখের দিনের অবসান হইয়া গেল। নীলাচলের পূর্ণ-শশী হাসিতে হাসিতে লীলা সঙ্গোপন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। সব নিস্তব্ধ। ভক্তগণ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনানন্দের পরিবর্ত্তে কেবল "হা গৌরাঙ্গ" এই ধ্বনি উঠিল। শোকাকুল ভক্তগণের শোকাশ্রু-ধারা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নীলাচলের মধু ফুরাইয়া গেল।

মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কিছুদিন পরেই আবার শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী প্রভুও তাঁহার অনুগমন করিলেন। রঘুনাথ এই মহাবিরহে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি আর নীলাচলে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। জগৎ শূন্য-শূন্য বোধ হইতে লাগিল। নিজের জীবন-ধারণও অত্যন্ত কঠিন মনে হইল।

"মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর 'গুপ্ত সেবা' কৈল স্বরূপের সাথে॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০পঃ ৯১-৯২)

এমন রঘুনাথ আজ প্রভুহারা। প্রভু কর্ত্তৃক তিনি শ্রীল দামোদরস্বরূপের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রভুর গুপ্তসেবায় অধিকারও পাইয়াছিলেন; ['গুপ্তসেবা' বলিতে—'যে-সকল সেবাকার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না। প্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম, কীর্ত্তনাদিকালে যে-সকল অভীষ্ট প্রিয়সেবার প্রয়োজন, তাহাই 'গুপ্তসেবা' বা 'অন্তরঙ্গ-সেবা' নামে কথিত হইয়াছে।"] কিন্তু তাঁহাকেও হারাইলেন। এইবার তিনি মনে করিলেন, "আর কেন, মহাপ্রভু চলিয়া গেলেন, শ্রীপাদ স্বরূপও তাঁহার অনুগমন করিলেন, এখন এই দেহ রাখিয়া আর লাভ কি? হায়, এই জীবন যে ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল! ক্লেশ ভোগের জন্য আর এই জীবন ধারণ করি কেন? এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই প্রাণ আর রাখিব না। তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করিতে হইবে।" রঘুনাথ তখন প্রভুদত্ত শিলার দিকে তাকাইয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, শ্রীগোবর্দ্ধনেই 'ভৃগুপাত' করিয়া (অর্থাৎ পর্ব্বতের উচ্চ

সানু হইতে পড়িয়া। পর্ব্বতোপরিস্থ সমতল স্থানকেই 'সানু' বলে) প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীপুরুষোত্তম-ধামের নিকট চিরবিদায় লইলেন। গুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা সঙ্গে লইয়া ১৬ বৎসর প্রেমানন্দে অবস্থানের পর, রঘুনাথ আজ মহাবিষাদের শোকাশ্রুতে পরিসিক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে,—

"প্রভুর বিয়োগে, স্বরূপের অদর্শনে।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবনে॥"

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। শ্রীগৌররূপী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মুখকান্তি রঘুর হৃদয়ে উদিত হইল। তাঁহার শোকের বেগ আরও বাড়িয়া গেল। শোকসময়ে সুহৃদের দর্শনে প্রথমে শোকের বেগ খুবই বৃদ্ধি পায় বটে, তবে পরে সুহৃদ্‌গণের সন্দর্শনে ও তাঁহাদের সুমধুর আলাপে অনেক পরিমাণে শোকাবেগ লাঘবও হইয়া থাকে। রঘুনাথ বহুদিন পরে তাঁহার চিরসুহৃৎ হৃদয়-বন্ধু ভ্রাতৃযুগল মহাভাগবত শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

"ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ, 'ভৃগুপাত' করিয়া॥
এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০পঃ ৯৩-৯৫)

শ্রীরূপ-সনাতন ও রঘুনাথ

মহাভাগবত দুই ভাই তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। বহুদিন পরে ভ্রাতায় ভ্রাতায় দেখা হইলে যেমন আহ্লাদের সঞ্চার হয়, এই ভীষণ শোকের সময়েও তখন এই তিনজনের হৃদয়ে শোকমিশ্র আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তাঁহাদের মধুর সম্ভাষণে, প্রীতিপূর্ণ সান্ত্বনায়, নিষেধ ও অনুরোধে রঘুনাথ ভৃগুপাতে মরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথকে তাঁহারা তাঁহাদের তৃতীয় ভাইর মত জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বদা মহাপ্রভুর লীলা বিস্তারিত-ভাবে শ্রবণ করিতে থাকিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আঃ ১০।৯৬-৯।)—

"তবে দুই ভাই তাঁ'রে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ পরম সুহৃদ্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার বয়স শ্রীপাদ সনাতনের অপেক্ষা অনেক কম হইলেও তিনি এই কঠোর বৈরাগ্যাবতার রঘুনাথকে বৈষ্ণব–শাস্ত্র বিস্তারের পরম সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন (১ম তরঙ্গ ৭৮২-৭৮৩)—

"রঘুনাথ দাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে।
বৃন্দাবনে গেলা যৈছে না পারি কহিতে॥
সনাতন, রূপ, রঘুনাথ এই তিনে।
রঘুনাথ চেষ্টাদিক বিদিত ভুবনে॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস যখন শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন, সেই সময় এই ভ্রাতৃযুগলের নাম সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত। পাণ্ডিত্যে, ভজন-নিষ্ঠায়, বৈরাগ্যে ও বিনয়ে তাঁহারা 'গোস্বামী' নামে খ্যাতি লাভ করিয়া

সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও পূজিত। এদিকে শ্রীমদ্ রঘুনাথও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের তুল্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা এইজন্য তাঁহাকে সহোদর তুল্যই মনে করিতেন। রঘুনাথ এক মুহূর্ত্তও তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতেন না। তাঁহারা যেভাবে সাধন-ভজন করিতেন, তিনিও সেইরূপ ভাবেই সুতীব্র নিষ্ঠার সহিত ভগবদনুশীলন করিতেন। এই তিনজনকে লোকে এক প্রাণ বলিয়াই জানিত। ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদ্ রঘুনাথ "শ্রীমৎ দাস গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। বিনয়-খনি শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই ভ্রাতৃযুগলকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। 'মনঃশিক্ষা'র তৃতীয় শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজ-ভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥"

অর্থাৎ হে মন! শ্রবণ কর, যদি তুমি প্রতি জন্মে অনুরাগযুক্ত হইয়া ব্রজধামে নিবাস এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের শীঘ্র সেবাবিষয়ে অভিলাষ কর, তাহা হইলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, সগণ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে স্মরণ ও নমস্কার কর।

শ্রীমদ্ রঘুনাথ বৈরাগ্যের স্ফুট মূর্ত্তি—ভজন-সাধনের সুমহান্ মূর্ত্ত আদর্শ। তথাপি শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইয়া তিনি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর শ্রীচরণের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রসজ্ঞ আদর্শজ্ঞানে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করতঃ ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিতেন,—"শ্রীমদ্ রূপের কৃপাতেই আমার মন শ্রীভগবানের লীলা-রসাস্বাদনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।" তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এই দুই ভ্রাতার কৃপানুগ্রহ ও মিত্রতা লাভ করিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থির হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ ভ্রাতৃদ্বয় যখন শ্রীমদ্

রঘুনাথের নিকট মহাপ্রভুর সুধাময়ী লীলা-কথা শ্রবণ করিতেন, তখন শ্রীরঘুনাথ তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি শ্রীশ্রীশচীনন্দনাষ্টক-স্তোত্র ও শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধন প্রান্তে

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী কিছুদিন শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর চরণান্তিকে বাস করিয়া শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের নিভৃতস্থানে ভজন করার জন্য তাঁহাদের কৃপানুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভজননিষ্ঠ দাস গোস্বামী শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগিরিরাজ দর্শনে তাঁহার নয়ন-যুগল প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া গেল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"আহা! এই গিরিরাজ দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার কলেবর বিশাল করিয়া 'আমিই শৈল' এই বাক্য বলিতে বলিতে পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে গোবর্দ্ধনের প্রতি ব্রজবাসীদের বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। গিরিরাজ ব্রজবাসীদের বড়ই প্রিয়। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইয়া গিরিরাজের পূজা করিয়া প্রেমাবেশে নাচিতে নাচিতে তাঁহাকে পরিক্রমা করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি নানা মহিমা তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক হইতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ রঘুনাথকে যে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন, নীলাচলে থাকিতেই তিনি তাঁহার গূঢ়মর্ম্ম অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীগোবর্দ্ধন-প্রান্ত ও শ্রীরাধাকুণ্ডই তাঁহার ভাবী ভজন-স্থলরূপে প্রভু ইঙ্গিত করিলেন। এক্ষণে তিনি

শ্রীগিরিরাজের চরণান্তিকে আসিয়া তাঁহার সেই স্মৃতি আরও প্রবলা হইল, তিনি তথায় সাধন-ভজনে গভীরভাবে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড

ক্রমে তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ-বিহ্বলতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি এতদিন শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণকথায় দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীগোবর্দ্ধনের নিভৃত প্রদেশে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহাপ্রভু ও শ্রীদামোদরস্বরূপের বিরহানল অত্যধিক বাড়িয়া উঠিল। দৈন্যের খনি রঘুনাথ অতীব দৈন্য-সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট প্রার্থনা করিতেন,—"হে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন! আমি অতি কপট, আমার বৈরাগ্য লোক-দেখান' মাত্র, আমি প্রতারক, শঠ, আমার মনে এক, মুখে আর। তোমার চরণে স্থান পাইবার অযোগ্য আমি। তবে এইমাত্র ভরসা যে, তুমি আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করিবে না, কারণ তোমার অতি প্রিয় শ্রীশচীনন্দনই আমাকে তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন।" এইরূপ দৈন্য-সূচক একটি প্রার্থনা-স্তোত্রও তিনি তৎকালে রচনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন শ্রীগোবর্দ্ধন-সমীপে সাধন-ভজন করিবার পর শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ভজনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রেমময়ী শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রী-কুণ্ডাশ্রয় পূর্ব্বক তথায় যুগলসেবা-রসে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার দৈনিক কৃত্য হইল—দুই সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ-প্রণাম, লক্ষ নাম গ্রহণ, মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা, একপ্রহর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা, আর অপতিতভাবে তিন সন্ধ্যা রাধা-কুণ্ডে স্নান করা। তিনি ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের খুব সম্মান করিতেন। এদিকে আহারের অন্ন জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া শুধু একটু মাঠা

গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সাড়ে সাত প্রহর তাঁহার সাধন ভজনে অতিবাহিত হইত। চারি দণ্ড কাল মাত্র নিদ্রা যাইতেন, কোনদিন বা তাহাও নহে অর্থাৎ দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি ভগবদনুশীলনে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার দৈনিক ভজনরীতি এইরূপ উল্লিখিত আছে—

"অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০২)

শ্রীল দাস গোস্বামীর সাধন-রীতি অতি চমৎকার। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার॥" (ঐ ১০৩)

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে "প্রভু" বলিয়া জানিতেন এবং তিনি তাঁহাদের নিত্যদাস এইরূপ অভিমান করিতেন। তাঁহার শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থের আদ্যন্ত প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥" এইরূপ ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীল দাস গোস্বামী যখন শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ভজন আরম্ভ করেন, তখনও শ্রীকুণ্ডের বহিঃসংস্কার সম্পাদিত হয় নাই। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই লোকলোচনে বহুকালাবধি লুপ্ত মহাতীর্থ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি বন ভ্রমণ করিতে করিতে অরিষ্টগ্রামে (আরিট গাঁও) আসিয়া একটি তমালবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় গ্রামবাসিগণকে কুণ্ডদ্বয়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারিলেন না। মথুরা হইতে যে বিপ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনিও তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্—সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি জিজ্ঞাসা তাঁহার একটী লীলা-ভঙ্গী মাত্র। তিনি দেখিলেন—তত্রত্য দুইটি ধান্যক্ষেত্রই সেই কুণ্ডদ্বয়। তাহাতে অল্প জল বাধিয়াছিল। মহাপ্রভু তাহাতেই স্নান করিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সযত্নে তিলক ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন—বন্ধুগণ, এই সন্ন্যাসী সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রই আজ এইবেশে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। আমরা 'কালী' ও 'গৌরী' নামে দুইটি ধান্যক্ষেত্র করিয়াছিলাম, এই দিব্যদর্শন সন্ন্যাসী সেই গৌরী ধান্যক্ষেত্রটিকে 'রাধাকুণ্ড' ও কালী ধান্যক্ষেত্র বা কৃষ্ণধান্যক্ষেত্রকেই 'শ্যামকুণ্ড' বলিয়া জানাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ একদিন মনে মনে চিন্তা করিলেন—শ্রীকুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজকে ধিক্কার করিলেন, "ছি! ছি! আমার মনে এইরূপ বাসনার উদয় হইল কেন? কুণ্ডদ্বয় জলপূর্ণ করা ব্যয়সাপেক্ষ। আমি ত' নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী। আমার মনে অর্থসাধ্য-কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা হইল কেন? তিনি পুনঃ পুনঃ আত্মধিক্কার করিতে করিতে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান পূর্ব্বক নিজের মনকে বুঝাইয়া সাবধানে ভজন করিতে

লাগিলেন। যথা, শ্রীঘনশ্যাম দাস-কৃত ভক্তিরত্নাকর (৫ম অরঙ্গ ৫৩২-৫৩৫)—

"অকস্মাৎ রঘুনাথ-মনে এই হৈল।
কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল ॥
অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়া হইলেন স্তব্ধ-প্রায় ॥
আপনাকে ধিক্কার করয়ে বার-বার।
কেন এ বাসনা মনে হইল আমার ॥
বিবিধ প্রকারে নিজ মন বুঝাইয়া।
রহয়ে নির্জ্জনে অতি সাবধান হৈয়া ॥"

কঠোর বৈরাগ্যবান্ রঘুনাথ, তাঁহার মনের একটি নিভৃত কোণে এইরূপ চিন্তার উদয় হওয়াতেই তিনি নিজেকে মহাপরাধী বলিয়া বিচার করিতে লাগিলেন! কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ যে পরম দয়াল, তিনি যে ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি ত' তাঁহার ভক্তের কোন বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না, তাই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করিলেন—

"ভক্তমনে যে হয় তা' না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত-মনঃকথা ॥"

(ভঃ রঃ ৫ম তঃ ৫৩৬)

জনৈক ধনী ভক্ত বদরিকাশ্রমে গিয়া শ্রীনারায়ণের পাদমূলে বহু অর্থ রাখিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। মহাভাগ্যবান্ সেই ধনী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—শ্রীমন্নারায়ণ বলিতেছেন—"এই মুদ্রা এখানে রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইহা লইয়া তুমি শীঘ্র ব্রজে আরিট গ্রামে যাও। সেখানে একজন বৈষ্ণব-চূড়ামণি দেখিতে পাইবে, নাম তাঁহার রঘুনাথ দাস। তাঁহাকে বলিও বদরিকাশ্রমের শ্রীমন্নারায়ণ আপনার জন্য এই মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, তিনি হয়ত' এই মুদ্রা গ্রহণ

করিতে চাহিবেন না। তখন তাঁহাকে তাঁহার মনের ইচ্ছা অর্থাৎ কুণ্ডদ্বয় জলপূর্ণ করিতে যে বাসনা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং এই মুদ্রা লইয়া তাহা সম্পাদন করিতে বলিবে। ইহা স্বয়ং শ্রীনারায়ণের আদেশ বলিয়া জানাইয়া দিবে।"

মহাজন পরদিন প্রভাতে মুদ্রাগুলি লইয়া দ্রুতগতি আরিট গ্রামাভিমুখে যাত্রা করতঃ যথা সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথের চরণ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মুদ্রাভেটসহ প্রণাম পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। রঘুনাথ করুণাবরুণালয় শ্রীহরির অপার করুণা-স্মরণে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে শেঠজীর ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে ঐ সকল অর্থ দিয়া তাঁহাকেই অবিলম্বে ঐ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার বা পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শেঠজীও পরমানন্দে তখনই বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অতিসাবধানে ভক্ত ও ভগবন্মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। যথা,—

"এত কহি বিদায় করিলা সেইক্ষণে।
আরিট-গ্রামেতে তেঁহ আইলা হর্ষমনে॥
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আগে গিয়া।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া॥
প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা।
শুনি' রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা॥
কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বারবার।
'শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার'॥
শুনি' মহাজন মহা-আনন্দ হৈলা।
সেইক্ষণে বহুলোক নিযুক্ত করিলা॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ৫৪২-৫৪৬)

শীঘ্রই কুণ্ডদ্বয় স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রঘুনাথের বাঞ্ছাও পূর্ণ হইল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। শ্রীরাধাকুণ্ডতটই

তাঁহার প্রধান ভজনাশ্রয় হইল, তিনি দিবারাত্রি এই শ্রীকুণ্ডতটেই ভজনানন্দে বিভোর থাকিতেন।

ভজন-কুটীর ও ভক্ত-সমাগম

শ্রীল রঘুনাথ দাস কোন কুটীরাদিতে বাস করিতেন না, বৃক্ষ-তলেই দিবারাত্র কাটাইয়া দিতেন। একদিন শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বাসায় শুভাগমন করিয়া স্নানের নিমিত্ত মানস-পাবন-ঘাটে গেলেন। সেখানে দেখেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র জল পান করিতেছে, আর তাহারই নিকটে শ্রীল রঘুনাথ ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন, ব্যাঘ্রটা জল পান করিয়া তাঁহারই পাশ দিয়া বনে প্রবেশ করিল।

"দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটির করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে॥
একদিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে।
এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে॥
মানস-পাবন-ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে—এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে॥
রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁ'র নিকট হইয়া॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ ৫৫৪-৫৫৭)

কিছুক্ষণ পরে রঘুনাথের ধ্যান ভগ্ন হইলে চাহিয়া দেখেন, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী স্নান করিতে আসিয়াছেন। অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভূমিতে পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন স্নেহাবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে সস্নেহে

বলিলেন—"রঘুনাথ, তুমি আর গাছতলায় থাকিতে পারিবে না। তোমার জন্য একখানি কুটীর করিয়া দিতেছি। এখন হইতে সেই কুটীরে থাকিয়াই ভজন-সাধন করিবে।"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর কৃপা-আদেশে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে একখানি নিভৃত নির্জ্জন শান্তিময় পর্ণ-কুটীর শ্রীমদ্ রঘুনাথের প্রেম-ভক্তির ভজনকুটীর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি এই কুটীরে বসিয়া কখনও বাহ্যদশায়, কখনও বা অন্তর্দ্দশায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলার অনুধ্যান ও অপ্রাকৃতনেত্রে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। তাঁহার 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থখানি এই কুঞ্জসেবার পরিস্ফুট সাক্ষী।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অবস্থানের পর হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের অভিমুখে ভক্তগণের চিত্ত অধিকতর-রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারই কৃপা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাসাধিকার লাভ হয়। শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অপূর্ব্ব অনুরাগময় ভজন-সাধন—তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালার অত্যুৎকট প্রেমময়ী সেবা দর্শন ব্রজ-বাসী বৈষ্ণবগণের দৈনন্দিন ভজনকৃত্যরূপে পরিগণিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম ও তাঁহার সেইস্থান দর্শন করিতে গমনাগমন করিতেন।

দাস ব্রজবাসী নামে একজন সেবাপরায়ণ-শিষ্য তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই থাকিতেন। রঘুনাথ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই কুণ্ডের তীরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন সাধন-ভজনে নিমগ্ন, তখন গৌড়দেশ হইতে আর এক জন পরমবৈষ্ণব—যিনি অমৃতময় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা, সেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনিও বৈষ্ণবজগতে খুবই সুপরিচিত। তিনিও (অর্থাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার চরণান্তিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকাতে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রত্যহ শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ

করিবার সৌভাগ্য হয়। ফলে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করতঃ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার-ভাবে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহাঁ কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥" —চৈঃ চঃ ম ২।৮৪

ইহাছাড়া তিনি 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'ও রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণতলে শ্রীস্বরূপ দামোদর, স্বরূপের পাদমূলে রঘুনাথ এবং রঘুনাথের পাদমূলে কৃষ্ণদাস, ইহা অতীব কৃষ্ণপ্রীত্যুদ্দীপক দৃশ্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ রঘুনাথের পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীশ্রীগৌর-লীলা-প্রেমধারায় নিজেও অভিষিক্ত হইলেন এবং ভক্তগণকেও সেই লীলা-সুধা উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে অসহ্য বিরহ

শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপের কৃপা লাভ করিয়া শ্রীস্বরূপের বিরহ-জ্বালা অনেক পরিমাণে প্রশমিত করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীসনাতন গোস্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহাকে আর কোথাও যাইতে দিতে চাহিতেন না। শ্রীঅঙ্গও তাঁহার ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ অবস্থায়ও স্নেহময় শ্রীসনাতন শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া তাঁহার অত্যধিক স্নেহপাত্র শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকে দর্শন দিতেন এবং সুমধুর স্নেহ-বাক্যে পরিতৃপ্ত করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার শ্রীচরণ-সঙ্গ-সুখাস্বাদন করিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু এই সুখ-সৌভাগ্যও তাঁহার বেশী দিন রহিল না। এক বিরহ-জ্বালার নিবৃত্তি হইতে না হইতে আবার আর এক বিরহ-জ্বালা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিল। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার প্রতি অতি স্নেহশীল জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রীপাদ সনাতন। হায়, তিনিও তিরোহিত হইলেন! কিছুদিন পরে তদনুজ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও জ্যেষ্ঠের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অনুসরণ করিলেন। এই দুই জনের অপ্রকটে শ্রীল রঘুনাথ আর বিরহ-জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। শ্রীবৃন্দাবন যেন এখন তাঁহার নিকট শূন্য অরণ্যবৎ মনে হইতেছে। তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডও, এমনকি সমস্ত জগৎই যেন তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল। 'প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকে' এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোহজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥"

["আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায়, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে।"]

শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপার কথা মনে করিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীরূপ শ্রীদাস গোস্বামীর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি বিবিধ-প্রকারেই করিতেন। সাধন-ভজনের উপদেশ দিতেন, গ্রন্থ লিখিয়া তাহা গাঠ করিতে দিতেন। এমন কি তাঁহার মতামতও গ্রহণ করিতেন। সাধারণ প্রাকৃত জগতে কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি জ্যেষ্ঠের যেরূপ স্নেহবাৎসল্য দেখা যায়, তাহা হইতে এই স্নেহ অনেক বেশী—অতুলনীয়। শ্রীমদ্ রঘুনাথও বলিয়াছেন এই স্নেহের জগতে তুলনা হয় না। 'ভক্তিরত্নাকর' পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত আছে,— শ্রীরূপ 'ললিতমাধব' নাটক লিখিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথকে সেই নাটক পড়িতে দিলেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রলম্ভ-রসের প্রকটমূর্ত্তি। আবার

গ্রন্থখানিও বিপ্রলম্ভ-রসের বিশুদ্ধ আধার। সুতরাং গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িত। কখনও বা গ্রন্থখানি বুকে ধরিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, কখনও বা দূরে সরিয়া কাঁদিতেন, আবার কখনও বা উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেন অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। যথা,—

"শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দাবনে।
কহি কিছু, আসিয়াছিলেন যে-কারণে॥
'ললিত-মাধব'—বিপ্রলম্ভ-সীমা যাতে।
পূর্ব্বে দিয়াছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে॥
গ্রন্থ পাঠে রঘুনাথ দিবা-নিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে—ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥
কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি'।
কভু ভূমে পড়ি' রহে গ্রন্থ বক্ষে করি'॥
খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত।
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মূর্চ্ছিত॥"

—ভঃ রঃ ৫ম তঃ ৭৬৬-৭৭০

শ্রীল রঘুনাথের এই প্রকার নানা দশার আবির্ভাব দেখিয়া বৈষ্ণব-মাত্রেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার এই শোকের কারণ দেখিলেন—'ললিতমাধব-নাটক'। তিনি শীঘ্রই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। সেই ঔষধ হইল—'দানকেলি-কৌমুদী' গ্রন্থ। তিনি তাঁহার এই প্রকার শোক অপনোদনের জন্যই এই গ্রন্থখানি রচনা করিলেন। দয়াময় শ্রীরূপ এই গ্রন্থখানি হাতে করিয়া তাঁহার প্রিয়তম রঘুনাথের নিকট গেলেন, "ভাই রঘুনাথ—এই নূতন গ্রন্থখানি একটু আস্বাদন কর এবং 'ললিত-মাধব' খানি আমাকে দাও, উহা একটু সংশোধন করিতে হইবে।" রঘুনাথের

গ্রন্থখানি ছাড়িবার মোটেই ইচ্ছা নাই। তথাপি সংশোধন করিতে হইবে শুনিয়া গ্রন্থখানি দিলেন এবং 'শ্রীদানকেলি-কৌমুদী' গ্রন্থখানি গ্রহণ করিলেন। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার অনেক ক্লেশ দূরীভূত হইল, এবং ক্রমে তিনি আবার মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

"শ্রীরূপ-গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি'।
'দানকেলি-কৌমুদী' বর্ণিলা শীঘ্র করি'॥
রঘুনাথে কহে—ইহা কর আস্বাদন।
পূর্ব্ব গ্রন্থ দেহ' মোরে, করিব শোধন॥
রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে।
শোধন করিব শুনি' দিলা শ্রীরূপেরে॥
দানকেলি-পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর॥

—ভঃ রঃ ৫ম তঃ ৭৭১-৭৭৪

উভয়ের মধ্যে এই প্রকার প্রীতির আদান-প্রদান ছিল। তাই আজ তাঁহার বৃন্দাবন শূন্য হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাকৃত জগতের মাতা-পিতা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলকেই অতি সহজে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পারমার্থিক আত্মীয়গণের বিয়োগে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না।

"'কোথা শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন'—বলি'।
ভাসয়ে নেত্রের জলে, বিলুঠয়ে ধূলি॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥"

—ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তঃ ২৩৪-২৩৫

এই প্রকার শোকে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। নীলাচলে গমনের পর হইতেই তিনি রসনা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আহার ছিল না বলিলেই হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহের পর হইতে তিনি অন্ন

পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। দুই, তিন পল মাঠা ও ফল গ্রহণ করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বিরহে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। কেবল একটু জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এক্ষণে শ্রীরূপের বিচ্ছেদে জলটুকুও ত্যাগ করিলেন। এই প্রকার কঠোর বৈরাগ্যের সহিত বিরহসন্তপ্ত-হৃদয়ে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

সাধন-ভজন

সাধন দ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহাই 'সাধ্য' বা চরম প্রয়োজন। যে উপায় অবলম্বন করিয়া সেই সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, তাহারই নাম 'সাধন'। প্রত্যেক জীবের সাধ্য-বস্তু পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাতে প্রীতি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভের উপায় ভক্তিই সাধন, আর তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির নামই ভজন। সাধনের এই ক্রমোন্নতি শিক্ষা দিবার জন্যই যেন এই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীরঘুনাথের আবির্ভাব। শৈশবকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মলাভের জন্য তাঁহার কিরূপ ব্যাকুলতা! ক্রমে ক্রমে ভক্তের ব্যাকুলতা এবং ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপার সংযোগে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া পৌঁছিলেন। নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি সাধন আরম্ভ করেন। সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় তাঁহার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর আকার ধারণ করিল। সেই সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গুঞ্জামালা এবং শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা দিলেন অর্থাৎ তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-সেবা লাভ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইলেও এখানে তিনি আচার্য্যের লীলা করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং আচার্য্যোচিত কার্য্য

তাঁহাকে করিতে হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীদামোদরস্বরূপের অপ্রকটের পর রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে থাকিয়া প্রকটলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকিলেন। এইস্থানে আসিয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য-ভাব কঠোরতম-রূপে প্রকাশ পাইল। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে তিনি আহার নিদ্রাদি সবই জয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এইরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা।" তিনি সাড়ে সাত প্রহরই ভক্তির সাধন করিতেন আর চারিদণ্ড কাল মাত্র নিদ্রা যাইতেন অর্থাৎ ৬০ দণ্ড কালের মধ্যে ৫৬ দণ্ড কালই একনিষ্ঠভাবে ভক্তি-সাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। কোন কোন দিন বা সেই চারিদণ্ডকালও নিদ্রা যাইতেন না, গেলেও স্বপ্নে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা দর্শন করিতেন।

এইপ্রকার অবস্থায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এমন কি যেন বাতাসে হেলিয়া পড়িত, তথাপি তাঁহার ভজনের নিয়মের অন্যথা হইত না। যথা,—

"অতিক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে॥
যদ্যপিহ শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি' উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে, কিছু, না কহয়ে তারে॥
অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বার বার।
দেখি' সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার॥
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাসরে।

দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দু'নয়নে॥
দাস-গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে?
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিহারে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ ২৩৫-২৪১)

কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যদেহের দুর্ব্বলতা দেখা গেলেও তাঁহার অন্তর প্রেমরস-পুষ্ট। নিত্যসিদ্ধ পরমহংসকুলের লোকশিক্ষার্থ সাধকোচিত লীলাদর্শ প্রদর্শন ভাগ্যবান্ ভক্তগণেরই অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী অগ্রে শ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত গৌরচরিত্র চিন্তা করিতেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধ্যানে বিভোর থাকিতেন। তাহার পরেই তাঁহার চিত্তে শ্রীব্রজরসের আবির্ভাব হইত। গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণও এই প্রকারেই ভজন করিয়া থাকেন। ইহাই অর্থাৎ গৌরানুগত্যে যুগলভজনই প্রকৃত ভজনের প্রণালী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বতঃ একই বস্তু। তথাপি পরম-ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীল শ্রীগৌরাঙ্গ গুরু-রূপে নিজভক্তগণের মাধ্যমে ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নিজ ভজনাদর্শদ্বারা ব্রজরসের ভজন-মাধুর্য্য শিক্ষা না দিলে লোকে তাঁহার ব্রজধাম ও ব্রজলীলা-বিলাস-তত্ত্ব বা ব্রজরসমাধুরী বুঝিতে পারিত না। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-রহস্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীগৌর-মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

আমাদের সাধন-পথে অগ্রসর হইবার একটি প্রধান বাধা "বৈষ্ণবচরণে অপরাধ"। আমরা বৈষ্ণবগণকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত মর্য্যাদা দিতে পারি না, ফলে তাঁহাদের চরণে নিরন্তর কতই না অপরাধ করিয়া ফেলি! শাস্ত্র আমাদিগকে এ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৫৬-১৫৭

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' (মধ্য ১৩।৩৮৭—৩৯১) লিখিয়াছেন,—

"সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥
শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রণাম—তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥

তথাহি (ভাগবত ৫।১০।২৫)—

'মহদ্বিমানাৎ সকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥'

['মহতের অবমাননা করায় সেই স্বকৃত অবমাননাফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির (মহাদেবের) ন্যায় বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥']

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্বশাস্ত্রে কই ॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥"

আমাদের ভজন-শিক্ষা-গুরু শ্রীল দাস গোস্বামীও কিরূপভাবে বৈষ্ণবের সম্মান করিতে হয়, তাহা নিজে আচরণ করতঃ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুইসহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥"

(চৈঃ চঃ আ ১০।৯২, ১০১)

তিনি দৈনিক দুই সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন। অর্থাৎ দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন। দৃষ্ট-শ্রুত বৈষ্ণবগণকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দুই সহস্র প্রণাম করিতেন। ভক্তিরত্নাকরেও দেখিতে পাই,—

"শ্রীদাস গোস্বামীর দেখ ভজনের রীতি।
দৃষ্ট-শ্রুত বৈষ্ণবের করেন নতি স্তুতি ॥"

সুতরাং ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইলে, আমাদের সর্ব্বপ্রথমেই একান্ত কর্ত্তব্য বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সংরক্ষণ। এ-বিষয়ে উদাসীন থাকিলে অধঃপতন অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভজনের মধ্যে শ্রীহরি-নাম-জপের কথাও প্রচুর উল্লেখ আছে। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ অতি শৈশবেই তাঁহার চরণ-ধূলি পাইয়াছিলেন এবং প্রত্যহ লক্ষনাম জপ করিতেন। দিবা-নিশিই তিনি জপে নিমগ্ন থাকিতেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দর্শনার্থে গিয়া তাঁহাকে নাম-জপেই বিভোর দেখিয়াছেন। আবার শ্রীজাহ্নবা মাতাও তাঁহাকে সেই একই অবস্থায় দেখিয়াছেন। যথা, ভক্তিরত্নাকর (১১শ তরঙ্গ ১৬৩)—

"শ্রীদাস গোস্বামী সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে।
করেন শ্রীনাম গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥"

শ্রীহরিনামই কলিহত জীবের একমাত্র সাধন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ (বৃহন্নারদীয়ে)—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অর্থাৎ "কলিতে হরিনাম বই আর গতি নাই। হরিনামই একমাত্র গতি।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাব্দিকাবতার শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন—

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৮, ৯, ১১)

তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শ্রীশিক্ষাষ্টকেও আছে—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

[চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবের চন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।]

নাম ও নামীতে কোনই ভেদ নাই—

'যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

নামের মাহাত্ম্য অনন্ত। অনন্তদেব তাঁহার অনন্তবদনে বর্ণনা করিয়াও সে মাহাত্ম্যের অন্ত পান না। আমার মত ক্ষুদ্র জীবাধমের পক্ষে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রেমভরে নিরন্তর নাম-জপে মগ্ন থাকিতেন অর্থাৎ তিনি নিরন্তর ভগবৎ-সান্নিধ্যে থাকিতেন। এই প্রকার ভজন করিতে করিতে অধিকাংশ সময়ই তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে লীলা দর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" স্তব যেন শ্রীবৃন্দাবনের রস-সুধায় পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রেমপূরাভিধস্তোত্র, স্বসঙ্কল্প প্রকাশস্তোত্র, প্রার্থনামৃত প্রভৃতি স্তোত্রেও তাঁহার ব্রজলীলার স্বরূপাবস্থান-সূচক প্রমাণ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী সর্ব্ব-সাধকেরই আদর্শ স্বরূপ। সাধনভক্তি হইতে কিপ্রকারে ধীরে ধীরে প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, তিনি জীব-জগৎকে তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সাধকমাত্রেই তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে ভজন-মার্গে প্রবৃত্ত হইলে তৎকৃপায় শীঘ্রই সাফল্যলাভে সমর্থ হইবেন। এইপথে অধঃপতনের কোনই আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান-যুগে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরণ, প্রেমের নামে কামোপভোগ—ইহাই সহজ রীতি। কিন্তু এই মহাপুরুষের আদর্শ সর্ব্বদা স্মরণ-পথে জাগরূক রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে কোন বাধাতেই কিছু করিতে পারিবে না।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এইরূপে তাঁহার ভৌমলীলার শেষের দিন-গুলি মানসিক-সেবার ভাবে বিভাবিত হইয়া যাপন করিতেছিলেন। ক্রমেই তাঁহার নিত্য স্বরূপাবস্থানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল এবং দেহও দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িল। তখন,—

রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি, সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেমে অশ্রু পড়ে,
রাধা-পদ করয়ে স্মরণ॥"

নিত্যলীলায় প্রবেশ

এই প্রকার চিদানন্দে মগ্ন থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-পরিকর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী কিভাবে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ব্রজলীলায় প্রবেশ করিলেন, তাহার গূঢ়রহস্য একমাত্র শুদ্ধভক্তগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমার ন্যায় অধমের পক্ষে সেই অচিন্ত্য-রাজ্যের লীলা-বিলাস বর্ণনা করা কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তাঁহার অন্ত্যচরিতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি

শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণসহ মধ্যে মধ্যে চকিতের ন্যায় তাঁহার সম্মুখেই দর্শন করিতেন; কিন্তু হস্তপ্রসারণ করিয়া শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। তিনি তখন কাঁদিয়া আকুল হইতেন। শ্রীমতীর চরণান্তিকে স্থান পাইবার জন্য শ্রীমদ্দাস গোস্বামী কিপ্রকার ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহা স্বরচিত বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকে ॥"

"হে রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি তোমার দাসী, তোমারই দাসী, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুমি আমার ঈশ্বরী, তোমার চরণ না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও যে প্রাণ রাখিতে পারিতেছি না। ইহা জানিয়া আমায় অচিরে তোমার চরণান্তিকে স্থান দাও।"

শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপ্রভুর প্রত্যেকটি স্তবের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি কি ভীষণ-বিরহ-জ্বালা নিরন্তর অন্তরে বহন করিতেন। ইহার ভিতরে ত' কোন কৃত্রিমতা নাই। এই ভাব যে তাঁহার অন্তর্নিহিত নিষ্কপট ভাবোচ্ছ্বাস, তাহা যে নির্ম্মল নির্ঝরের ন্যায় নিরন্তরই তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত হইত।

শ্রীরাধানিত্যজন দাস গোস্বামীর এই প্রকার কাতরোক্তিতে শ্রীমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অন্তর্য্যামিভগবান্ শীঘ্রই ভক্তের ডাকে সাড়া দিলেন, দয়াময়ী বৃন্দাবনেশ্বরী অচিরেই তাঁহার প্রিয়তমা দাসীর অভীষ্ট পূরণ করিলেন। পঞ্চদশ শকের অন্তে কয়েক বৎসর গত হইলে আশ্বিন-মাসের শুক্লা-দ্বাদশী-তিথিতে শ্রীরঘুনাথের দেহ ক্রমে ক্রমে নিস্পন্দ হইয়া আসিল। যে-রসনা নিরন্তর ভগবন্নাম জপে নিযুক্ত থাকিত, তাহা আর নড়িল না, আর নেত্রের বিরহ-অশ্রু শেষবারের জন্য আনন্দাশ্রুতে মিলিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীমুখমণ্ডল এক অলৌকিক উজ্জ্বল-ভাব

ধারণ করিল। শান্ত, সুন্দর ও স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর মধ্য দিয়া শ্রীরতি-মঞ্জরীকে সঙ্গে লইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধা যেন অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি যাঁহারা সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহারা তখন দারুণ বিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথ-রূপ প্রকটদেহে শ্রীগৌর-লীলায় এতকাল বৈরাগ্য ও ভজন-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আবার অন্তে ব্রজলীলার পরিকরত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি তাঁহার 'স্বনিয়মদশকে'র নবম শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুর সম্মুখে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে প্রয়াণঅভিলাষ করিয়াছেন,—"মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥" আজ তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। তাঁহার প্রিয় সেই রাধাকুণ্ডের তীরেই তিনি নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। প্রকটকালেও তিনি শ্রীগৌরহরির কৃপাপ্রেমরসে আপ্লুত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দন ও নৃত্যগীত করিতে করিতে সর্ব্বদাই বলিতেন—"শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড জীবনে মরণে গতি।" তাঁহার প্রিয়তম স্থান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান-কোণে 'শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর শ্রীগৌরলীলা-পরিকর-দেহ-অপ্রাকট্যের নিদর্শন'-স্বরূপ সমাধি এখনও বর্ত্তমান। এখনও বহু ভক্ত প্রতি দিবস তাঁহার সেই প্রেমভক্তিপ্রদ নাম উচ্চারণ করিয়া সেই পবিত্র স্থানটি অশ্রুতে পরিসিক্ত করেন।

তাঁহার ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদের আবির্ভাব এবং তিরো-ভাব আমার মত অধমের পক্ষে সবই সমান। তাঁহাদের আবির্ভাবেও আমার সুখানুভূতি নাই, আবার তিরোভাবেও দুঃখ-বিহ্বলতা নাই। কারণ আমার ত' কোন অভাববোধ নাই। কিন্তু সেই স্তরের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ মহাপুরুষগণের অভাব সহ্য করা যে কি-প্রকার বেদনাদায়ক, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিম্ন-লিখিত বিরহ-গীতিটী আলোচনা করিলে সহজেই অনুভব করা যায়—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ. কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন ?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥"

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভুবনপাবন শ্রীচরিতামৃত আজও সর্ব্বজনবিদিত হইয়া রহিয়াছেন, আর রহিয়াছেন—তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী।

"রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয় ॥
শ্রীদানচরিত, মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥"
(ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৮৩০-৮৩১)

শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থত্রয়— (১) দানচরিত, (২) মুক্তা-চরিত ও (৩) স্তবাবলী বা স্তবমালা। 'স্তবাবলী' গ্রন্থখানিতে ২৯টী স্তব গ্রথিত আছে। যথা,—(১) শ্রীশচীসূনবষ্টকম্ বা শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (২) শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ, (৩) মনঃশিক্ষা, (৪) শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বা-মিনঃ প্রার্থনা, (৫) শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্, (৬) শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা-দশকম্, (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (৮) ব্রজবিলাসস্তবঃ, (৯) বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিঃ, (১০) প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্, (১১) গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা, (১২) স্বনিয়মদশকম্, (১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্, (১৪) শ্রীরাধিকাষ্টকম্, (১৫) প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ, (১৬) স্বসঙ্কল্প-প্রকাশস্তোত্রম্, (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ,(১৮) প্রার্থনামৃতম্, (১৯) নবাষ্টকম্ (২০) গোপালরাজস্তোত্রম্, (২১)শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্,

(২২) বিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্, (২৩) শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, (২৪) উৎকণ্ঠা-দশকম্, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্, (২৬) অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্, (২৭) দান-নির্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্, (২৯) অভীষ্টসূচনম্।

বদ্ধজীব আমি। দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টাই সংসার লইয়া ব্যস্ত হইয়া আছি। এই সংসার ব্যতীত যে আর মঙ্গলময় কোন বস্তু আছে, তাহা আমার বোধ নাই, সুতরাং এই নিত্যমুক্ত মহাপুরুষের অমৃতময় জীবন কাহিনীর প্রকৃত মাধুর্য্য মাদৃশ জীবাধম দ্বারা কি করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে? কিন্তু "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া", তাই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশ প্রতিপালনার্থ তাঁহারই অহৈতুকী কৃপামাত্র ভরসা করিয়া আজ এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আমার এইমাত্র ভরসা যে, বৈষ্ণবগণ বড়ই করুণাময়, দয়ালের শিরোমণি তাঁহারা, কাহারও দোষ ত্রুটি গ্রহণ করেন না। তাই বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি পতিতপাবন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুও এই অধমের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার আর একটি বড় ভরসা যে, তাঁহারই অভিন্ন-স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব যখন তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে মাদৃশ অধমকে স্থান দিয়াছেন, সেই সূত্রেও হয়ত আমার ত্রুটী-বিচ্যুতি গ্রহণ করিবেন না। শুনিয়াছি, শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ভক্ত-গণের একটু স্তব-স্তুতি করিলেই তাঁহাদের কৃপা লাভ করা যায়, কারণ তাঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট হন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু এই অধমের অজ্ঞতাজনিত সমস্ত অন্যায় অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং কৃপা করুন যেন শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়া সাধন-ভজনের পথে একটু অগ্রসর হইতে পারি। তাঁহারই অভিন্ন-স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার এই অধম সন্তানের সমস্ত অন্যায় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন নিষ্কপটে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ষড়্‌গোস্বামীর গুণাবলী সমন্বিত নিম্নলিখিত স্তবটীর দ্বারা তাঁহাদের বন্দনা করিতেন। আমিও তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি,—

শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্‌

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

যাঁহারা নৃত্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদির গান ও উচ্চকীর্ত্তননিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃতের সাগরস্বরূপ, বিদ্বান্‌ ও অবিদ্বান্‌ সর্ব্বজনপ্রিয়, সকলের প্রিয়-আচরণকারী, নির্ম্মৎসর, সর্ব্বজন-সম্মানিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ কৃপাপাত্র এবং যাঁহারা জগজ্জীবের উদ্ধার দ্বারা জগতের ভারহরণকারী, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ১ ॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

যাঁহারা নানাশাস্ত্র বিচারে অতিশয় নিপুণ, সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপক, সর্ব্বলোকের হিতকারী, ত্রিভুবনের সকলের মান্যপাত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ

আশ্রয় এবং যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-ভজনানন্দে প্রমত্ত, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যান্বিতৌ
পাপোতাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গগুণানুবর্ণনে শ্রদ্ধা ও সমৃদ্ধিযুক্ত, গোবিন্দ-বিষয়ক গানামৃতদ্বারা জীবগণের পাপতাপ নির্ম্মূলকারী, আনন্দসিন্ধুবর্দ্ধনে অতিশয় নিপুণ এবং যাঁহারা জীবকে মোক্ষ হইতে নিস্তার করেন, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন. শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষ্টককে আমি বন্দনা করি। ৩ ॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

যাঁহারা সমগ্র মণ্ডলপতিগণকে সর্ব্বদা তুচ্ছবুদ্ধিতে সত্বর ত্যাগ করতঃ করুণাবশে দীনজনগণের পরিপালক হইয়া কন্থা-কৌপীন-আশ্রয়কারী এবং যাঁহারা ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাবামৃতরূপ সিন্ধুর তরঙ্গরূপ হর্ষে পুনঃ পুনঃ মগ্ন, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ৪ ॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

যাঁহারা কূজনকারী কোকিল-হংস-সারস-ময়ূরগণ-ব্যাপ্ত এবং নানারত্ন-বদ্ধমূল বৃক্ষশ্রেণীর শোভাযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্র শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের ভজনপর এবং যাঁহারা জীবগণকে পুরুষার্থ দান করেন, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ৫ ॥

সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নামগান ও প্রণামদ্বারা কালযাপনকারী, নিদ্রা-আহার-বিহারাদি জয়কারী, অত্যন্ত দৈন্যবিশিষ্ট এবং যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণস্মরণের মাধুর্য্যজনিত আনন্দে সম্মোহিত, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ৬ ॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

যাঁহারা কখনও রাধাকুণ্ডতটে, কখনও যমুনাতীরে, কখনও বা বংশীবটে প্রেমোন্মাদে প্রমত্ত হইয়া নানাদশা প্রাপ্ত হন, কখনও বা শ্রীহরির গুণগান করিয়া ভাবাভিভূত হন, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-ষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ৭ ॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে ! চ ললিতে ! হে নন্দসূনো ! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।

ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

হে ব্রজদেবী রাধে ! হে ললিতে ! হে কৃষ্ণ ! তোমরা কোথায় ? তোমরা কি এখন গোবর্দ্ধনের কল্প-বৃক্ষতলে বা যমুনার উপকূল-বনে ?—এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে সমস্ত ব্রজপুরে যাঁহারা সর্ব্বদা খেদে মহাবিহ্বল হইয়া ভ্রমণ করিতেন, সেই শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-ষট্‌ককে আমি বন্দনা করি। ৮ ॥

ইতি শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতং
শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামি-গুণলেশসূচকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য-নামে কথিত শ্রীরাধাবল্লভ দাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীটি পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর শোচক

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,
শুনইতে রঘুনাথ দাস।
নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্র-সম সুখ যা'র,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু পাশ ॥
উঠি' রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোবেগে চলি' যায়,
সদা চিন্তে চৈতন্য-চরণ ॥

একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গো-বাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা॥
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি' যায়।
যিনি ঘোড়া দোলা বিনে, পথশ্রম নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটিয়ে সেই পায়॥
যিঁহো বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি',
ষড়্‌রস করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যা-কালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন॥
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দু'নয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করে অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথ দাস।
তাঁহার প্রসঙ্গে মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁর পদ-রেণু করে আশ॥
শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস-চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
কলত্র-গৃহ-সম্পদ, নিজ-রাজ্য-অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিল॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণনামে, গিয়া সে পুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।

এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,
নয়ন-গোচর হ'বে কবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া, 'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্র দিয়া,
গোবর্দ্ধনশিলা-গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল যাঁহারে ॥
গৌরাঙ্গের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি' করে,
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দু' গোঁসাই তাঁহারে রাখিলা ॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিল তাঁ'র জীবন,
দেহ-ত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে, রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে,
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা ॥
ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান, ব্রজফল গব্য পান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি', স্মরণ-কীর্ত্তন করি'
রাধাপদ ভজন যাঁহার ॥
ষাটদণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারিদণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
তিলার্দ্ধেক ব্যর্থ নাহি যায় ॥
চৈতন্যের পাদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
অভিন্ন শ্রীরূপ সনে, গতি যাঁ'র সনাতনে,
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত, যাঁহার পদ-আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁ'র জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি', কান্দি' বলে 'হরি হরি',
প্রভুর করুণা হ'বে কবে॥
হে রাধিকার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকার বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ॥
প্রভু রূপ সনাতন, তিন হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা দেহে প্রাণ রাখি,
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসুত, তাঁ'র গুণ যত যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থান, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবগণ,
সভাকারে করয়ে প্রণাম॥
রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
রুখা শুখা অন্ন মাত্র সার।
শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে, অন্ন ছাড়ি' সেই হৈতে,
ফল গব্য করেন আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি' রাখে প্রাণ॥
স্বরূপের অদর্শনে, না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে।

কৃষ্ণকথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥"
কাঁদে গোঁসাই রাত্রদিনে, পুড়ি' যায় তনু মনে,
বিরহে হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরা'বে মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে করে অভিলাষ,
সভে মোরে করহ প্রসাদ ॥

শোচক সমাপ্ত